উন্নতজীবন গ্রন্থমালা

রোকেয়া জীবনী

শামসুন নাহার বি. এ.

অক্টোবর, ১৯৩৭

বুলবুল পাবলিশিং হাউস

২৩, ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক :—মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বি. এ.
বুলবুল পাবলিশিং হাউস
২৩, ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার্স—মরিস্ ভি. গাফ-গভিয়া
এলায়েন্স্ প্রেস লিমিটেড,
২৪ থিয়েটার রোড, কলিকাতা।

দাম এক টাকা]

উপহার

প্রথম যখন রোকেয়া-জীবনী লিখিবার কল্পনা করি তখন রোকেয়া জীবিত ছিলেন। এই মহিমময়ী নারীর সঙ্গে কয়েক বৎসর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। অবসর সময়ে গল্প করিতে করিতে তিনি আপনার জীবনের নানা বিচিত্র ছবি আমার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেন। এভাবে তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ও ততোধিক অদ্ভুত চরিত্রের এমন বহু নিগূঢ় তথ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়াছে যাহা জানা অন্য কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে।

রোকেয়া-জীবনী রচনার গোড়ার কথা আলোচনা করিতে গিয়া সকলের আগে যাঁহাকে স্মরণ করি তিনি আমার মা। এই অদ্ভুত নারীর বিচিত্র জীবন কাহিনী লিখিয়া সাধারণে প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলের আগে তিনিই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই কথামত আমি রোকেয়া-জীবনী লেখায় হাত দিই। ইহার উপকরণ সংগ্রহের দায়িত্বও অনেকটা মায়েরই। রোকেয়ার মৃত্যুর পরও তিনি যে কোন সুযোগে নানা জনের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে ভালবাসিতেন। রোকেয়ার সঙ্গে তিনি আজ একই লোকে বাস করিতেছেন। আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সাধের রোকেয়া-জীবনী তাঁহার জীবনকালে দিনের আলোক দেখিতে পাইল না। সময়ের অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ একথা বলিয়া অপরাধ বাড়াইব না। দীর্ঘসূত্রতাকে প্রশ্রয় না দিলে বোধ হয় এই ক্ষুদ্র পুস্তক শুধু মায়ের নহে, স্বয়ং রোকেয়ারও চরণ ছুঁইয়া ধন্য হইতে পারিত। আজ মরণের পর-পার হইতে এই দুই মহীয়সী নারী আমার পরিশ্রমের এই ক্ষুদ্র ফলটিকে আশীর্বাদ করুন!

রোকেয়া-জীবনীর যাঁহারা মাল-মশলা যোগাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ইসকান্দর গজনভী, শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ, মিসেস্ এইচ. টি. হোসায়ন, মিসেস্ এফ. রশীদ ও মিঃ সাবের প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সকলের শেষে একথাও স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে আমার অগ্রজের দায়িত্ব নিতান্ত কম নহে। তিনি অনবরত তাড়া না দিলে রোকেয়া-জীবনী কবে প্রকাশিত হইত বলা কঠিন।

গত বৎসর মাসিক বুলবুলে রোকেয়া-জীবনী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেসময় পাঠিকা ভগ্নিদের মধ্যে অনেকে ইহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছেন ; শুধু পড়িয়াছেন এমন নয়, পড়িয়া নিজেদের মধ্যে এক নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কেহ কেহ নিজ মুখে একথা উল্লেখও করিয়াছেন।

যাঁহাদের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক লেখা হইল, তাঁহাদের প্রত্যেকে ইহাকে স্নেহের চোখে দেখিলে ধন্য হইব।

'বুলবুল' হাউস
কলিকাতা।

শামসুন নাহার

রোকেয়া-জীবনী



বেগম রোকেয়া

পরিচয়

'বোন, এই ইংরাজী ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।'— পরম আদরের বালিকা ভগ্নির সম্মুখে একখানা বড় ছবিওয়ালা ইংরাজী বই খুলিয়া ধরিয়া এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আজি হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে এক কিশোর যুবক। কি ছিল কথাগুলির মধ্যে জানি না, কিন্তু কি এক যাদুমন্ত্রের প্রভাবে বালিকার হৃদয় মুগ্ধ হইল। সেদিন সেই মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে জ্ঞানসাধনার যে মহামন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইলেন, তাহাই হইয়াছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। বালিকার নাম রোকেয়া। উত্তরকালে ইনিই মিসেস আর. এস. হোসায়ন নামে বাংলা দেশে পরিচিত হন। বাংলার মুসলমান নারীপ্রগতির ইতিহাস-লেখক এই নামটিকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না।

বেগম রোকেয়া যে যুগে জন্মিয়াছিলেন এই বাংলার মাটিতে, সে ছিল মুস্‌লিম ভারতের ইতিহাসে এক আঁধার যুগ।

রাজ্য গিয়াছিল, সিংহাসন গিয়াছিল—সেটা তত বড় কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল জাতির সব চেয়ে বড় অকল্যাণ। ইস্‌লামের সত্যিকারের শিক্ষা ভুলিয়া হৃতসর্ব্বস্ব মুসলমান সেদিন হাবুডুবু খাইতেছিল কুসংস্কার আর গোঁড়ামির পাঁকে।

যে সময় গোটা সমাজের ছিল এমন শোচনীয় অবস্থা, তখন কুলবালাদের দশা ছিল কি—আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের দেহ কণ্টকিত হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ধকার পুরীর বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বন্দিনী মুস্‌লিম নারী। শিক্ষার আলোক তাহাদের জন্য হইয়াছিল হারাম; সত্য ও সুন্দর তাহাদের জীবন হইতে হইয়াছিল একেবারে নির্ব্বাসিত।

সেই বীভৎস আঁধারে বেগম রোকেয়ার মনে কেমন করিয়া জ্বলিয়াছিল জ্ঞানের আলো, কেমন করিয়া জাগিয়াছিল মুক্তির পিপাসা—তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। ভ্রান্ত মোল্লাদের প্রতিবাদ তুচ্ছ করিয়া, সমাজের তীব্র কটূক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আপন হৃদয়মন তিনি আলোকিত করিয়াছিলেন শিক্ষার আলোকে, স্বাধীনচিন্তার আলোকে। শুধু তাহাই নয়। সেই আলোকের ক্ষীণ শিখায় ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁর চারিপাশের সমাজ,—অবরোধ-বন্দিনী নিগৃহীতা নারীসমাজ। শুধু দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকেন

নাই। তাহার অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। শত শত বন্দিনী নারীর মর্ম্মের কথা অসহ্য বেদনায় রূপলাভ করিয়াছিল তাঁহার লেখায়, তাঁহার সাহিত্যে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী কাজে। কেমন করিয়া শত বাধানিষেধের নাগপাশ হইতে তাহাদের মুক্তি দেওয়া যায়, কেমন করিয়া আলোকের পথে, কল্যাণের পথে, ধ্রুব ও সত্যের পথে তাহাদের তুলিয়া দেওয়া যায় —এই-ই হইয়াছিল তাঁহার দিনের চিন্তা আর রাত্রির স্বপ্ন। সেই কাল রাত্রির অন্ধকারে জ্ঞানের দীপ না জ্বলিলে হতভাগিনী বন্দিনীদের মুক্তি নাই, তিনি বুঝিয়াছিলেন এই কথা। ভিতর হইতে সাড়া না আসিলে কারাগৃহের দ্বারের অর্গল খুলিবে না, তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এই সত্য। তাই ঘুমন্ত নারী-শক্তিকে নব জীবনের বোধন-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছিলেন তিনি আপন হাতে। তাদের প্রত্যেকটী জীবনকে উন্নত, আলোকিত ও সুন্দর করিয়া তুলিবার সাধনাই হইয়াছিল তাঁহার জীবন।

পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মুসলমান নারীসমাজ আর আজিকার সমাজের অবস্থা তুলনা করিতে গেলেই চোখে পড়ে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন। যুগযুগান্তের স্বপ্নের কুহক ভাঙ্গিয়া আজ তাঁহারা জাগিয়াছেন। বন্ধন কাটিয়া একে একে দু'য়ে দু'য়ে তাঁহারা আজ সমবেত হইতেছেন মুক্ত বিশ্বের মুক্ত

আকাশতলে। জগতের জাগর লোকে তাঁহাদের শূন্য আসন আজ সত্য সত্যই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এই জাগরণের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে যে মহিমময়ী নারীর নাম আগাগোড়া ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, আপনার হৃদয়রক্তে যিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যুগের জীবন-কাহিনী—তিনি আর কেহই নহেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়ন।

পায়রাবন্দ

রংপুর জেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রাম। পায়রাবন্দের বিখ্যাত সাবের বংশের কন্যা রোকেয়া। ধনেমানে, শিক্ষায়, বংশগৌরবে সাবের পরিবারের তুলনা ছিল না। বিস্তীর্ণ লাখেরাজ জমি জুড়িয়া তাঁহাদের আবাসবাটি। রোকেয়ার স্বরচিত গ্রন্থে এক জায়গায় লিখিত আছে—"আমাদের এ অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়! সাড়ে তিনশত বিঘা লাখেবাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, 'বউ কথা কও' 'ও খুকি, ও খুকি', 'চোখ গেল' প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যা ত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া ক্যাহুয়া' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখীর 'কা আক্ কা আক্ কু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশব-জীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।"

রোকেয়া যখন সংসারে আসিলেন তখন সাবের বংশের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ

ভাগ। ভারতীয় মুসলমানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের উপর নামিয়া আসিয়াছিল যে কালরাত্রির ছায়া, এই সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ঘিরিয়া তাহাই পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। গৃহবিবাদ, বিলাসিতা প্রভৃতি যে যে কারণে ভারতে মুসলমান রাজত্বের পতন হয়, সাবের পরিবারের ধ্বংসের কারণও তাহাই হইল।

রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। পূর্ব্বপুরুষের বিস্তর জায়গা জমি ও সম্পত্তি তাঁহারই অপব্যয়িতা ও বিলাসিতার মুখে তাসের ঘরের মত উড়িয়া যায়। তিনি আরবী ও ফারসীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু সে যুগের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বাসা বাঁধিয়াছিল।

সাবের পরিবারের মেয়েরা ছিলেন ঘোর পর্দ্দানশীন। আজ আমরা মনে করি আমাদের চলিবার পথে অনেক প্রতিবন্ধক, সমাজের অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমাদের পথ চলিতে হয়; কিন্তু তুচ্ছ মনে হয় এ যুগের কুসংস্কার, যখন মনে পড়ে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার—রোকেয়ার শৈশবের সেই আঁধার যুগের কথা। আজ আমরা হয়তো পুরুষের সামনে পর্দ্দা করি। কিন্তু তখন কুলবালারা পর্দ্দা করিতেন মেয়েদের সঙ্গেও। রোকেয়া বলিয়াছেন—তাঁহাদের পরিবারের মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরাণী ছাড়া

অন্য কোন মেয়ে মানুষের সামনে বাহির হইতেন না। যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারিতেন তাঁহারই তত বেশী কুলগৌরবের পরিচয় পাওয়া যাইত।

রোকেয়া লিখিয়াছেন—'সে অনেক দিনের কথা, রংপুর জেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমিদার বাড়ীতে দুপুর বেলা এক জমিদার-কন্যা আঙ্গিনায় মুখ হাত ধুইতেছিলেন। আলতার মা পাশে দাঁড়াইয়া জল ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক এই সময়ে এক মস্ত লম্বা চৌড়া কাবুলী স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত। হায় হায় সে কি বিপদ! আলতার মা চেঁচাইয়া উঠিল—বাড়ীর ভিতর পুরুষ মানুষ! স্ত্রীলোকটী হাসিয়া জানাইল—সে পুরুষ নয়। জমিদার-কন্যা প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভ্যন্তরে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—পাজামা-পরা একটা মেয়ে মানুষ আসিয়াছে। গৃহকর্ত্রী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে তোমাকে দেখিয়া ফেলে নাই তো? কন্যা সরোদনে বলিলেন—হাঁ, দেখিয়াছে। অপর মেয়েরা শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন। কেহ বাঘ ভাল্লুকের ভয়েও বোধ হয় এমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।'

আর একজায়গায় রোকেয়া লিখিতেছেন—"সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দ্দা করিতে

হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দ্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই; কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণ-ভয়ে যত্র তত্র—কখনও রান্না ঘরের ঝাপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল-করিয়া-জড়াইয়া-রাখা পাটীর অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম। বাচ্চাওয়ালা মুরগী যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবা-মাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে লুকায়, আমাকেও সেইরূপ লুকাইতে হইত। কিন্তু মুরগীর ছানার ত মায়ের বুক-স্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে লুকাইয়া থাকে; আমার *জন্য* সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগীর ছানা স্বভাবতঃই মায়ের ইঙ্গিত বোঝে—আমার ত সেরূপ কোন স্বাভাবিক ধর্ম্ম (Instinct) ছিল না। তাই কোন সময়ে চক্ষের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ 'কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া' ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।

"আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে এই কলিকাতা থাকা কালীন



রোকেয়ার মাতা ও ভগ্নিপুত্র 'হালু'

(অর্থাৎ স্যার আবদুল হালিম গজনবী)

আমার দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধূর পিত্রালয় হইতে দুই জন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের ফ্রী পাসপোর্ট' ছিল—তাহারা সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্র তত্র কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নীচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জ্জন চিলকোঠা ছিল। অতি প্রত্যূষে আমাকে 'খেলাই' কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত। প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। চাকরাণীদ্বয় সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়সী ভগিনী-পুত্র হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই খাটের নীচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়-হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নীচে উঁকি মারিয়া দেখে! সেখানে কতগুলি বাক্স, পেঁটরা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার ছয় বৎসর বয়সের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারি ধারে দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজ-খবরও কেহ নিয়ম মত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিলকোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা

বিন্নি-খই আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলে মানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।”

সে যুগের মেয়েদের শুধু দেহই পর্দ্দানশীন ছিল না—পাছে পর পুরুষের চোখে পড়িয়া তাঁহাদের হাতের লেখার বেপর্দ্দা হয়, এই ভয়ে লেখাপড়া শেখাই ছিল তাঁহাদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। নিজের জ্যেষ্ঠা ভগ্নির বাল্যশিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়া রোকেয়া বলিয়াছেন—“চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টিয়া পাখীর মত কোরান শরীফ ছাড়া আর কিছুই পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না। ছোট ভাইয়েরা বাহিরে মুনশী সাহেবের কাছে ফারসী পড়িয়া আসিতেন—ভগ্নিকে শুনাইয়া ফারসী বয়েত আবৃত্তি করিতেন; তখন ভগ্নিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বয়েতগুলি মুখস্থ করিতেন। ভাইদের বাংলা পড়া শুনিয়া তিনিও মুখে মুখে বাংলা অক্ষর যোজনা করিতেন, প্রাঙ্গনে মাটিতে দাগ কাটিয়া বাংলা লিখিতেন। একদিন তিনি গোপনে একটা বটতলার পুঁথি লইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ পিতা আসিয়া পড়েন। কন্যা অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিলেন এই বুঝি সর্ব্বনাশ! কিন্তু না, পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখিয়া রাগ করিলেন না, বরং ভয়ে মুর্চ্ছিতাপ্রায় বালিকাকে কোলে লইয়া

আদর করিলেন এবং সেই দিন হইতে একটু একটু বাংলা সাধু ভাষা পড়াইতে লাগিলেন। বাস্ আর যায় কোথা? যত মোল্লা মুরুব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন—তাঁহাদের নিন্দা ও বাক্যজ্বালায় অধীর হইয়া পিতা তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।"

রোকেয়া যে আবেষ্টনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে এমনই পঙ্কিল, এমনই বিষাক্ত!

ভাইবোন

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা রচনা করে, না পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই মানুষ গঠিত হয়—একথা নিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। সংসারে অসংখ্য নর-নারী জন্মগ্রহণ করে, তার পরে গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে চলিতে দিন ফুরাইয়া গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। ইহারা সাধারণ মানুষ। ইহাদের জীবন বাস্তবিকই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই গঠিত হইতেছে। কিন্তু জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। গতানুগতিকের পন্থা তাঁহাদের জন্য নয়, পুরাতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাদের কাছে হার মানে। নিজের প্রতিভায়, নিজের শক্তিতে, মনের আনন্দে নূতন চলার পথ তাঁহারা রচনা করেন—আর সেই পথ বাহিয়া পশ্চাতে চলে আরও অগণিত নর-নারী।

পায়রাবন্দের সাবের পরিবারে এক সঙ্গে এমনই কয়েকটী সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল। দেশকালের অকল্যাণকর প্রভাব সে পরিবারে পূর্ণমাত্রায় সঞ্চারিত হইয়াছিল একথা আগেই বলিয়াছি। বিপুল ঐশ্বর্য্য ধ্বংশের মুখে; গৌরবের সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। কিন্তু ঘোর অকল্যাণের মধ্যেও করুণাময়ের অদৃশ্য কল্যাণহস্ত মানুষের অভিনন্দনের কোন্ বরণ-

ডালা কি ভাবে সাজাইয়া তোলে, বলা কঠিন। ধ্বংশের ভিতর দিয়াই সাবের পরিবারে সৃষ্টির নবরূপ বিকশিত হইয়া উঠিল। পঙ্কের মধ্যে কয়েকটী শতদল এক সঙ্গে গলাগলি করিয়া ফুটি ফুটি করিতে লাগিল !

রোকেয়ারা ভ্রাতা ভগ্নি পাঁচজন—দুই ভাই ও তিন বোন। তাঁহাদের পরিবারে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার শিকড় গাড়িলেও আমরা দেখিতে পাই অন্য দিক হইতে কেমন করিয়া যেন ধীরে ধীরে আধুনিকতার হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। অবরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও দুই ভাই—আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের কেমন করিয়া ইংরাজী শিক্ষার আলোক পাইলেন ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করিতেন। শৈশবে তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষের সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ তখন রংপুরের সিভিল সার্জ্জন। ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা ইব্রাহিম ও খলিলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সেই প্রভাবে ইঁহাদের দুটী তরুণ চিত্ত একেবারে অন্য ছাঁচে ঢালাই হইয়া গেল। তাঁহারা মনে মনে সৈয়দ আহ্‌মদ, ও আমীর আলীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলেন। শুনা যায় ইব্রাহিম ইংরাজী শিক্ষার অগ্রদূত আমীর আলীর সঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

তরুণ যুবক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন মানব-সংসারে জ্ঞানা-লোকের দিয়ালী উৎসব; সেই সঙ্গে দেখিলেন নিজের চারি পাশের অন্ধতমসা। মায়ের জাতি না জাগিলে দেশ জাগে না, মাতৃশক্তি উদ্বুদ্ধ না হইলে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, এই সত্য তিনি ভাল করিয়াই বুঝিলেন। ইস্‌লামে নারীর স্থান কত উচ্চে, ইস্‌লাম মাতৃজাতিকে কতখানি শ্রদ্ধা দিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন নিজের দেশ ভরিয়া নারী জাতির কি শোচনীয় দুর্গতি! তাঁহারও গৃহে তিনটী বোন রহিয়াছে—প্রখর বুদ্ধিমতী, প্রতিভাশালিনী। সুযোগ পাইলে ইহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিভার আলোকে বুঝি দেশ ধন্য হইতে পারিত!

গোপনে যে আকাঙ্ক্ষা ভাইয়ের মনে ধিকিধিকি জ্বলে তাহাই ক্রমে সংক্রামিত হইল জ্যেষ্ঠা ভগ্নির হৃদয়ে। জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেসা অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, একথা আগেই বলিয়াছি। রোকেয়া লিখিয়াছেন—"সমাজ তাঁহাকে গলাটেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা দেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিক বাতিকে স্তরের পর স্তর অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে অন্ধকার দেখায়; তিনিও সেইরূপ কাপড়চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই—

জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্জ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন।”

চৌদ্দ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইতে না হইতে তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পরে তিনি বহুচেষ্টায় বাংলা শিখিবার সুযোগ পান। ইংরাজী শিখিবার জন্যও তিনি কম সাধনা করেন নাই। কেবলমাত্র নিজের সাধনায় তিনি বেশ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধবয়সের একটী সুন্দর ঘটনা হইতে আমরা তাঁহার গভীর জ্ঞানপিপাসার পরিচয় পাই। রোকেয়া বলিয়াছেন—‘একদিন তিনি ও আমি প্লানচেটে হাত রাখিয়া নানা লোকের আত্মার দ্বারা লিখাইতেছিলাম। আমার খেলাইয়ের আত্মা ইংরাজীতে নাম লিখিল দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—খেলাই (আয়া) মৃত্যুর পর ইংরাজী শিখিয়াছে দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে অনায়াসে ইংরাজী শিখিতে পারিতাম।’

করিমুন্নেসা স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি পারিবারিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ে অনেক বাংলা কবিতা লিখিয়াছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি রীতিমত আরবীভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এইসময়ে তিনি কনিষ্ঠা ভগ্নিকে লিখিয়াছিলেন—“মন্ত্রপাঠের মত কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না—তাই আমি যথাবিধি আরবী পড়িতেছি।” তিনি ফারসী ভাষাও জানিতেন।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দেলতুয়ারে করিমুন্নেসার শ্বশুরালয়। বিবাহের নয় বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। বিধবা হওয়ার পর শিশুপুত্র তুইটীর শিক্ষার জন্য তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে। তাঁহার মুক্ত উদার মন ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইল। দেলতুয়ারে ছেলেদের শিক্ষার অনেক প্রতিবন্ধক—এজন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র আবতুল করিম গজনভীকে তিনি অল্প বয়সে বিলাত পাঠান ও কনিষ্ঠ পুত্র আবতুল হালিম গজনভীকে কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। সেযুগে এতবড় পাপ কার্য্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কি কি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা কুৎসা করিয়াছিল—তাহা বর্ণনা করা যায় না।

শৈশব হইতে যে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা করিমুন্নেসার মনে আকুলি বিকুলি করিত তাহাকেই রূপ দিয়াছিলেন তিনি তুই পুত্র ও কনিষ্ঠা ভগ্নি রোকেয়ার জীবনে। ইঁহারই স্নেহের প্রসাদে রোকেয়া শৈশবে ইংরাজী ও বাংলার বর্ণ পরিচয় পড়িতে শিখেন। রোকেয়া বলিয়াছেন "জ্যেষ্ঠা ভগ্নি আমাকে তু'হরফ বাংলা পড়াইবার জন্য সমাজের বহু নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন।" পরিণত বয়সে কলিকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনার কাজে ব্যাপৃত থাকা কালে রোকেয়া

পরম স্নেহশীলা এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন— "অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দ্দু ও ফারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে আমি বাংলা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া, বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবার একটী লোক না পাইয়াও বঙ্গভাষা যে ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া এগার বৎসর যাবত এই উর্দ্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি। এখানেও সকলেই—পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দ্দুভাষিনী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদের কল্যাণে।" পরম হিতৈষিণী এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নির জন্য আজীবন যে কৃতজ্ঞতা লোকচক্ষুর অন্তরালে কনিষ্ঠার চিত্ত ভরিয়া উছলিত হইত, তাহারই স্পষ্ট আভাস এই কথা কয়টিতে পাওয়া যায়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিমের একনিষ্ঠ সাধনাও রোকেয়ার জীবন-গঠনে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। বাস্তবিকই রোকেয়া আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে মঙ্গলের

বাণী—যে আলোকের বাণী লইয়া তাহার জন্য এই দুইটী নরনারীর কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশী ঋণী।

ক্ষুদ্র বোনটিকে ইব্রাহিম কেমন করিয়া নূতন পথের সন্ধান দিলেন, নূতন আশার বাণী শোনাইলেন—জীবনের প্রভাতে কেমন করিয়া তাহার কোমল চিত্তে অতি সন্তর্পণে রোপণ করিলেন আকাঙ্ক্ষার বীজ, তাহার আভাস প্রারম্ভেই দিয়াছি।

পিতা বাংলা বা ইংরাজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। দিনের বেলা সকল সময় পড়াশোনার সুযোগ হয় না। ভ্রাতাভগ্নি অপেক্ষায় থাকেন কখন দিন গিয়া রাত্রি আসিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পিতা শুইতে গেলে দু'ভাইবোনে বসেন পুঁথি পত্র লইয়া। গভীর রাত্রে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়—আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে দুটী কিশোর কিশোরীর শয়নকক্ষে স্তিমিত দীপ শিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দু'ভাই-বোনে মোমবাতির পাশে বসেন। জ্ঞান দান করেন ভাই, আর বালিকা ভগ্নি সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেন।

ইব্রাহিম মুখে মুখে ছাত্রীকে কত নূতন নূতন কথা শিখাই-তেন— কত দেশ বিদেশের কাহিনী বলিতেন। 'ক্ষুদ্র বোন রকু' অবাক হইয়া সমস্ত শুনিত—জ্যেষ্ঠের প্রত্যেকটী কথা, প্রত্যেকটী ভাবভঙ্গি যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে চলিয়া যাইত।

বালিকা রোকেয়া শেষ রাত্রে তাহাজ্জদের নমাজ পড়িতেন;

ভোর বেলায় পড়িতে হইত ফজরের নমাজ। গভীর রাত্রে পড়াশোনা শেষ করিয়া তাহাজ্জদের নমাজ পড়িয়া শুইলে জাগরণ-ক্লান্ত দেহখানি অসাড় ভাবে শয্যায় এলাইয়া পড়িত; ফলে এক একদিন সূর্য্যোদয়ের আগে শয্যাত্যাগ করিয়া ফজরের নমাজ পড়া আর হইয়া উঠিত না। এই অপরাধে রোকেয়াকে প্রতিবেশীদের অনেক গঞ্জনা সহিতে হইত। শিক্ষার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে এ কথা তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে বলিতেন। লেখাপড়া শিখিয়া মেয়ে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বিদ্রূপের কশাঘাত করিতেও তাঁহারা ছাড়িতেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোকেয়ার উৎসাহ বিন্দুমাত্রও দমিল না।

রোকেয়া নিজে বলিয়াছেন—"বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনো প্রবেশ করি নাই, কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন—কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারো বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।"

রোকেয়া দমিলেন না; তিনি অনুভব করিলেন, অনুদিন তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে—পর্ব্বতের মত অটল গম্ভীর জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার সুশীতল স্নেহচ্ছায়া। রোকেয়ার মনে যেমন অবসাদ কোনদিন আসে নাই, জ্যেষ্ঠের মনেও তেমনি মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তির আভাস জাগিতে পারে নাই; বরং ভগ্নির তরুণ হৃদয়কে তিনি শিল্পীর কৌশল দিয়া মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন—এক একবার দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া স্বপ্নরঙীন আশার ইঙ্গিতে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

সুযোগ পাইলে রোকেয়া দিনেও শতবার ভাইকে পড়া বলিয়া দিবার জন্য ডাকিতেন। পুত্রকে বারে বারে বিরক্ত করা হইতেছে ভাবিয়া মা সময় সময় রোকেয়াকে মৃদু তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু ইব্রাহিম সস্নেহে বলিতেন—"মা, তুমি বকিও না। এতে যে আমি কতো আনন্দ পাই তাহা তো তুমি জান না, মা।"

এইভাবে ভ্রাতাভগ্নির মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ দিন দিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল। ভ্রাতার সংসর্গে ভগ্নির মনের মণি-কোঠার আলো দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও সেই আলোকের স্থির নিষ্কম্প শিখা মুহূর্ত্তের জন্যও মলিন হয় নাই। সেই অন্তর-প্রদীপখানিকেই সাবধানে জ্বালাইয়া ধরিয়া তিনি চির দিন দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছেন।

সাখাওয়াৎ

দিন যায়। দেখিতে দেখিতে শৈশব কাটিল, কৈশোর কাটিল, রোকেয়া যৌবনের সীমায় পা দিলেন। তিনি একেই অসামান্যা সুন্দরী। শুভ্র সুন্দর দেহতনু যৌবনের রূপলাবণ্যে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। পিতামাতা কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরম হিতৈষী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিন্তার গতি এইসময় অন্যরূপ। ভগ্নি বড় হইয়াছে, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রতিভা শিক্ষার গুণে দিন দিন প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহার সম্মুখে রহিয়াছে জীবনের এক বিরাট পরিবর্ত্তন। বিবাহই তাহার ভবিষ্যত জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিবে। কেমন ঘরে কাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, কে জানে! সাবধানে ঘর বর নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে ভাই ভগ্নির দীর্ঘকালের সাধনা বুঝি বিফল হয়,—ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধ সমস্তই চূর্ণ হইয়া যায়! ইব্রাহিম চিন্তিত হইলেন। শুধু ধনজন, কুলমান দেখিয়া ভগ্নির বিবাহ দিলে তো চলিবে না। দেশকালের প্রভাব ব্যর্থ করিয়া এক নূতন ভাব তাহার মনে আশৈশব লালিত হইতেছে—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা চারিপাশের আবেষ্টন ছাড়াইয়া

আরও ঊর্দ্ধলোকে পাখা মেলিতেছে। ইব্রাহিম স্থির করিলেন এমন লোকের হাতে রোকেয়াকে সঁপিতে হইবে যিনি এই বিপুল সম্ভাবনাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিবেন।

রোকেয়ার ভাগ্য অনুকূল। বিধাতা তাঁহার জন্য মনোমত পাত্র মিলাইলেন। যাঁহার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল, ভাই ভগ্নির মত ইঁহারও সেই একই মতিগতি, একই কল্যাণবুদ্ধি।

বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে রোকেয়ার শ্বশুরালয়। রোকেয়ার স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াৎ হোসায়ন বি. এ, এম. আর. এ. সি. ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সে সময় তিনি উড়িষ্যার কণিকা ষ্টেটের কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিযুক্ত ম্যানেজার।

পাঠ্যজীবনে সাখাওয়াৎ কিছুকাল হুগলী কলেজে পড়িয়া ছিলেন। হুগলীর যশস্বী উকিল মজহারুল আনোয়ার তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়কেও তিনি সহপাঠীরূপে লাভ করেন। সাখাওয়াতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়া মুকুন্দ বাবু বলিয়াছেন—"সে বলিল, আমার নাম সাখাওয়াৎ হোসায়ন। আমার এখানে পরিচিত কেহ নাই। আমি দরিদ্র সৈয়দ, বিহারী মুসলমান। এখানকার কলেজের মাহিনা এক টাকা মাত্র, পাটনায় ছয় টাকা। মাসে মাসে উদ্বৃত্ত পাঁচ টাকা মাতাকে পাঠাইয়া দিতে পারিব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি।

বড়ই একা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়।" মুকুন্দ বাবু বলিয়াছেন—"আমার মনে হইল, এ কে মহাত্মা পুরুষ, মাতৃভক্ত, ত্যাগী উদ্যমশীল, উচ্চবংশজাত; যাচিয়া আলাপ করিতেছেন এবং বিদেশে সমপাঠী প্রতিবেশীর নিকট একটু প্রীতিভিক্ষা করিতেছেন। আমরা অহঙ্কারে মত্ত দল, সুখে পালিত, ইঁহার চরণরেণুর যোগ্য নই। আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। বলিলাম: 'ভাই, আমরা দুজনে প্রত্যহ বিকালে খানিকটা সময় একত্রে থাকিব।'

"সাখাওয়াতের পরামর্শ অনুসারেই আমরা উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তায় ইংরাজীর ব্যবহার ছাড়িয়া দিলাম। সে-ই বলিল—তোমার হিন্দীতে কথা বলিতে পারা উচিত। আমার বাংলায় কথা কহিতে পারার ইচ্ছা আছে, এ দেশে আসিয়া ভাষাটা না শিখিয়া ফিরিতে লজ্জা বোধ হইবে। তবে বাংলা বই পর্য্যন্ত পড়িবার অবকাশ হইবে না। তোমার সহিত কথা-বার্ত্তাতেই বাংলা সাহিত্যের খবর কতকটা জানিয়া লইব।"

পাঠ্যাবস্থায় এক প্রতিপত্তিশালী ধনী পরিবারে সাখা-ওয়াতের বিবাহের কথা হয়। কন্যার পিতা কর্ণেল হেদায়েৎ আলী নিজ খরচে সাখাওয়াৎকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইতে চাহেন। সাখাওয়াৎ দরিদ্র কিন্তু তেজস্বী, আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন। তিনি বলিয়াছেন—'আমি দরিদ্র, কিন্তু আমার মনের ভিতর গূঢ়ভাবে আভিজাত্যের বিশেষ অহঙ্কার

আছে। কর্ণেল হেদায়েৎ আলীর হঠাৎপ্রাপ্ত ধনের গর্ব্ব প্রচ্ছাদিত নহে। ওখানে বিবাহ করা আমার ঠিক হইবে না।'

অতঃপর সাখাওয়াৎ মাতার পছন্দমত এক আত্মীয় পরিবারে বিবাহ করেন। একটীমাত্র কন্যা হওয়ার পর অল্প বয়সেই সে পত্নীর দেহান্ত হয়। বিপত্নীক সাখাওয়াৎ দ্বিতীয় বারে যে রমণীরত্নের পাণিগ্রহণ করিলেন, তিনি আর কেহই নহেন—পায়রাবন্দের সাবের পরিবারের কন্যা, অপূর্ব্ব সুন্দরী, অশেষ গুণশালিনী বিদুষী রোকেয়া। শুভদিনে, শুভক্ষণে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়নের সঙ্গে পরিণয় প্রীতিবন্ধনে গ্রথিত হইলেন।

চরিত্রমাহাত্ম্য ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সাখাওয়াতের যোগ্যতাও বড় অল্প ছিল না। কৃষি-শিক্ষাব জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া তিনি ইংলণ্ডে যান। সংযমশীল, সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী, মেধাবী সাখাওয়াৎ বৃত্তিব টাকা হইতে ইংলণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহ কবিয়া প্রায় দেড হাজার টাকা সঞ্চয় করেন এবং অনেকগুলি প্রাইজ ও মেডেল লইয়া ফিরিয়া আসেন। স্পষ্টবাদিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণের জন্য চাকুরী জীবনে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলেও সাখাওয়াৎ পূর্ব্বেকার সাদাসিধা চালচলনই চিরকাল বজায় রাখিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সনে তিনি ভাগলপুরে কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট।

খলিফা বাগে বাড়ী, মাটির দোতলা। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে সেই বাড়ীকেই তিনি পরিচ্ছন্ন-সুন্দর করিয়া তোলেন। সাবেক পৈতৃক মাটির দেয়ালে বাহির পিঠে একখানি করিয়া ইট গাঁথিয়া তাহা পলস্তারা করিয়া চূণকাম করা হইল। ভিতর পিঠও পলস্তারা হইল। কিন্তু ভিতরে সেই সাবেক মাটিই থাকিয়া গেল। তিনি বলিতেন—"বাড়ীর আমূল পরিবর্ত্তন কেন করিব ? শরীর এবং মনের কি তাহা করিতে পারি। ভিতরে সাবেক সাখাওয়াৎই আছি। পড়াশুনা করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিয়া উপরে একটু চাকচিক্য হইয়াছে মাত্র।"

সাখাওয়াৎ তাঁহার নব-পরিণীতা শিক্ষিতা পত্নীর জন্য বাড়ীর ভিতরে একটী আট কোণা সুদৃশ্য ঘর তৈয়ার করাইয়া মনোরম ভাবে সাজাইয়াছিলেন।

বন্ধু মহলে সাখাওয়াৎ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন—"ভাগলপুরে বহু লক্ষপতি বিদ্যমান থাকিতেও সকলের চেয়ে আমিই স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন। কারণ চারিশত টাকা যখন মাসিক আয়, তখন মাসের শেষে আমার হাতে উদ্বৃত্ত টাকার সংখ্যা আড়াই শত। অথচ আমার ঘোড়া টমটম অন্যদের চেয়ে ভাল। আসল কথা এই যে আমার খরচ কম। কাপড় ছিঁড়ি কম। খাওয়া সাবেক মোটা ধরণের রাখিয়াছি।" একদিন এক ব্যারিষ্টার বন্ধু খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে সাখাওয়াৎ স্পষ্ট বলিলেন—

"আপনি তো জানেন, আমার পেটে ঘি হজম হয় না। আমি তৈলের তরকারী এখনো খাই। কোন ভোজের নিমন্ত্রণ আমার জন্য নয়। উহার পূর্ব্বে বেলা থাকিতে গিয়া গল্প করিয়া আসিব।"

সাখাওয়াৎ মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধনলোভ একেবারেই ছিল না। কণিকার রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে সম্পত্তি হাতে নিবার পর সাখাওয়াৎকে পত্র লেখেন। সাখাওয়াতের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সম্পত্তির নানাদিক দিয়া যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল অন্য কোন ম্যানেজারের আমলে তাহার কিছুই হয় নাই। সাখাওয়াতের পেনসানের জন্য মাসিক আড়াইশত টাকা গভর্ণমেণ্টে জমা দিয়াও মাসিক হাজার টাকা মাহিনাতে রাজা তাঁহাকে আবার নিজের সম্পত্তির ম্যানেজারীতে আনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। সাখাওয়াৎ উত্তর দিলেন— "তুমি যে টাকা দিতে চাহিতেছ তাহা যথেষ্ট। কিন্তু তুমি আমাকে খুড়া বলিতে, আমিও তোমাকে ছেলে-ভাইপোর মতই স্নেহ করিয়াছি। আমাদের সেই সম্পর্ক ঠিক থাকিবে তো? চাকর-মনিব সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমি করিব না।" প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পত্তির উন্নতি সাধন, দুদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে পরিমিত ব্যয় ইত্যাদি নিয়া তরুণ বয়স্ক রাজার সঙ্গে হয়ত মতভেদ হইতে পারে।

ফলে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে, পরিণামে রাজার সঙ্গে স্নেহ প্রীতির সম্পর্কও হয়ত আর বজায় থাকিবে না। এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া সাখাওয়াৎ মাসিক এক হাজার টাকারও বেশী আয় মিষ্ট কথায় ঠেলিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন পাঁচ শতের শ্রেণীতে ডিপুটী কালেক্টর।

পারিবারিক জীবনেও সাখাওয়াৎ ভাগ্যবান—পরম ভাগ্যবান। পত্নীর গুণে কেবল তাঁহার বিবাহিত জীবনই সুখের হইয়াছিল এমন নহে। পরবর্ত্তী কালে মৃত্যুর পরপারেও প্রেমময়ী পত্নী স্বামীর স্মৃতি যুগ যুগ ধরিয়া অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

রোকেয়াও ভাগ্যবতী একথা আগেই বলিয়াছি। সাখাওয়াৎ কুসংস্কারবর্জ্জিত, উন্নতমনা, উদারহৃদয়। স্ত্রীর সংসর্গে তিনি ভাল করিয়াই বুঝিলেন স্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন মুসলমান সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। পত্নীর শিক্ষার পথে তিনি শুধু যে বাধা দিলেন না এমন নহে, বরং পত্নীর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার বিকাশের সহায়তা করা তাঁহারই কর্ত্তব্য, একথা তিনি গভীর ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভাগলপুর

রোকেয়ার পিতৃপরিবারে মেয়েদের বাধা-নিষেধের অন্ত ছিল না একথা বলিয়াছি। কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুর পরিবারে আসিয়া রোকেয়া দেখিলেন, সে অঞ্চলের মেয়েরা আরও কূপ-মণ্ডুক। শুধু তাহাই নয়—তাঁহাদের যে একটা জীবন্ত সত্ত্বা আছে, সমাজ যেন তাহা স্বীকার করিতেও নারাজ। রোকেয়ার স্বলিখিত গ্রন্থে স্থানে স্থানে যে সব বর্ণনা আছে তাহাতে পর্দ্দা প্রভৃতি প্রথার বিকট রূপ দেখিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—নারী-জীবনের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদার জন্যই পর্দ্দা—না দেহমন এমনকি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া পর্দ্দার সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই নারীর সৃষ্টি।

রোকেয়া বলিতেছেন—"প্রায় একুশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। আমার দূর সম্পর্কীয় এক মামী শ্বাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন। সঙ্গে মাত্র এক জন পরিচারিকা। কিউল ষ্টেশনে ট্রেণ বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেণে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেণ ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। ষ্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরাণী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে চাকরাণী দোহাই

দিয়া নিষেধ করিল—খবরদার, কেহ বিবী সাহেবার গায়ে হাত দিও না। সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ট্রেণের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন—কোথায় তাঁহার বোরকা আর কোথায় তিনি। ষ্টেশনভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিল, কেহ তাঁহার সাহায্য করিবার অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল। তাঁহার চাকরাণী প্রাণপণে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিল আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় এগার ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। কি ভীষণ মৃত্যু!"

শুধু শ্বশুর পরিবারের কথাই নয়, দুর্ভাগ্য মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্যতর মেয়েদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার আরও বহু বহু কাহিনী রোকেয়ার মনে চিরদিনের জন্য শেলের মত গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সেই সুযোগে রোকেয়া নানা দেশ বিদেশ বেড়াইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পান। নানা স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির সঙ্গে মিশিয়া দিনে দিনে তাঁহার মনের দুয়ার খুলিয়া যায়। শৈশব হইতে যে সকল

নব নব ভাব তাঁহার মনের মধ্যে শত পাকে জট বাঁধিতেছিল, এখন দিনে দিনে যেন একটীর পর একটী করিয়া তাহাদের বন্ধন খুলিয়া যাইতে লাগিল।

রোকেয়া যেখানে গিয়াছেন সর্ব্বত্রই তাঁহার চোখের সম্মুখে তীব্রভাবে জাগিয়াছে নারীর পরাধীনতার বীভৎস রূপ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা যেন ভীষণ ব্যাধির মত আগাগোড়া ছাইয়া ফেলিয়াছে—বড় নিষ্করুণ, বড় মমতাহীন সে কাল ব্যাধির আক্রমণ।

তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার কি করুণ ছবি তাঁহার লেখনীমুখে স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তিনি লিখিয়াছেন—"পাঠিকা, আপনি কখনও বিহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামক জড় পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটী বধূ বেগমের প্রতিকৃতি দেখাই। ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে বসাইয়া রাখিলে রমণী জাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটী মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটী রুদ্ধ ও একটী মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে বোধ হয় পর্দ্দার অনুরোধেই বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীর পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বনাত-মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুল-রাগে-রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই বধূ বেগম! ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে

১০২৪০৲ টাকার অলঙ্কার। মাথায় অর্দ্ধসের (৪০ ভরি), কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি), কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা), সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি), কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি), ও চরণ যুগলে ঠিক তিন সের (১৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা! এরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়া চড়া অসম্ভব। সুতরাং হতভাগী বধূ বেগম জড় পদার্থ না হইয়া কি করিবেন! কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।" অন্তরের তীব্র ব্যথা ও অনুশোচনাকে তিনি এখানে হাস্যরসের আড়ালে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন!

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—'বিহার অঞ্চলে বিবাহের পূর্ব্বে ছয় সাত মাস পর্য্যন্ত নির্জ্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েকে আধ মরা করা হয়। ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না—প্রয়োজন মত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়। রাত্রিকালে সেখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়। ১৯২৪ সনে নাতিনীর বিবাহের নিমন্ত্রণে আরা গিয়াছিলাম। বেচারী তখন বন্দীখানায়! আমি সেই জেলখানায় গিয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারি না—সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আট-

কাইয়া আসে। বেচারী ছয় মাস সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে তাহার হিষ্টিরিয়া রোগের উৎপত্তি হইল।'

'আর এক বেচারী ছয় মাস পর্য্যন্ত বন্দিনী ছিল। বিবাহ হইলে দেখা গেল সর্ব্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটী চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে!'

শুধু অবরোধের অত্যাচার নয়, অবরোধের ভিতরে আরও নানাবিধ উৎপীড়ন। রোকেয়া বলিতেছেন—'আমরা রমা-সুন্দরীকে অনেক দিন হইতে জানি। তিনি বিধবা। সন্তান সন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে। কিন্তু তাঁহার দেবর এখন সে সকল সম্পত্তির অধীশ্বর। দেবরটী কিন্তু রমাকে এক মুঠা অন্ন এবং আশ্রয় দানেও কুণ্ঠিত। রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয়, কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না। এতগুণ সত্ত্বেও তিনি দেবরের সঙ্গে থাকিতে পান না কেন? কপালের দোষ! হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে বল কপালের দোষ। তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। রমা বলিলেন—'আমাদের সেই সহমরণ প্রথাই বেশ ছিল। গবর্ণ-মেণ্ট সহমরণ প্রথা তুলিয়া দিয়া বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিয়া-ছেন।' ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়? অন্তঃপুরের এ সকল ক্ষতকে নালীঘা না

বলিয়া আর কি বলিব ? এ রোগের কি ঔষধ নাই ? বিধবাও সহমরণ আকাঙ্ক্ষা করে। উৎপীড়িত সধবারা কি করিবে ?" এই সকল কথার অন্তরালে রোকেয়ার দরদী মনের অসহ্য বেদনা লুকাইয়া রহিয়াছে !

তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে বেশী করুণ মনে হইল একটি জিনিষ ; তিনি দেখিলেন : উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা নানাভাবে নানারূপে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া ইহাদের পিষিয়া মারিতেছে, কিন্তু হতভাগিনীদের তাহা অনুভব করিবারও শক্তি নাই। দৃষ্টি তাহাদের সঙ্কীর্ণ, মন অসাড়। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—কোন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই। বাস্তবিকই মানুষের যতক্ষণ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ যে-কোন দুর্গতির প্রতিকার একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না ; কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনই চরম সীমায় পৌঁছায়, যখন অনুভূতিটুকুও একেবারে লোপ পায়। Murder of Delicia (ডেলিসিয়া হত্যা) নামক ইংরাজী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"সভ্যতা ও স্বাধীনতার ললামভূমি লণ্ডন নগরীতেও শত শত ডেলিসিয়াবধকাব্য নিত্য অভিনীত হয়। হায়, রমণী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অবলা ! ইংলণ্ডের নারী সমাজের সহিত ভারত-ললনা-সমাজের কি চমৎকার সাদৃশ্য ! কিন্তু তাঁহারা বিদুষী এবং আমরা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। ডেলিসিয়ার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে

আমাদের তাহা নাই। নির্য্যাতিত প্রপীড়িত হইলেও ডেলিসিয়ায় কেমন এক প্রকার মহীয়ান গরীয়ান ভাব আছে; অত্যাচারী কর্ত্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্ব্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্তকরে প্রাণভিক্ষা চাহিবেন না! এই মহান ভাবটা আমাদের নাই। ইহার কারণ এদেশে স্ত্রী শিক্ষার অভাব।"

দেখিয়া শুনিয়া রোকেয়ার তরুণ মন এক অসহ্য বেদনায় নিশিদিন আলোড়িত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার বেদনা-বিদগ্ধ মনে জন্মগ্রহণ করিল, দেশের ও জাতির যে কল্যাণ কামনা—তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বাংলার নারী-ইতিহাসের একটি নূতন ধারার বীজ দিনে দিনে অলক্ষ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার নিজের শিক্ষাও দিন দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। স্বামী সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ, সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। বিবাহিত জীবন তাঁহাকে পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার স্নেহচ্ছায়া তখনো পর্য্যন্ত একেবারে অপসারিত হয় নাই। ভাই ভগ্নিতে চিঠিপত্র লেখালেখি সর্ব্বদাই চলে। ইংরাজী শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য চিঠিপত্র ইংরাজীতেই লেখেন। ইব্রাহিম ভগ্নির চিঠিগুলি পড়িয়া তাহাতে ভাষার কোন খুঁত

থাকিলে চিহ্নিত করিয়া পরবর্ত্তী ডাকে আবার তাহা ভগ্নির কাছে ফেরৎ পাঠান। ভগ্নি গভীর মনোযোগের সহিত সে সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লন। ভাইয়ের চিঠিতে আরো থাকে কত উৎসাহের কথা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী। রোকেয়া প্রত্যেকটী কথা সযত্নে মনের মধ্যে গাঁথিয়া লন। রোকেয়ার ভিতরকার মহৎ সম্ভাবনা যেন এভাবে দিনে দিনে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন তিনি ভবিষ্যতের এক বিরাট কার্য্যসাধনের জন্য নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

রোকেয়ার স্বামী অত্যন্ত উদার-ভাবাপন্ন, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, একথা আগেই বলিয়াছি। রোকেয়ার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যাসন্তান হইয়া অল্প বয়সেই মারা যায়। কাজেই রোকেয়ার সংসারের বন্ধন তত দৃঢ় নয়। এদিকে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কাহার জীবনের মেয়াদ কখন ফুরাইবে কিছুই বলা যায় না। দৃষ্টিমান স্বামী দেখিলেন—রোকেয়া নিঃসন্তান হইলেও তাঁহার বিবাহিত জীবনে যেন আর কোন অপূর্ণতা নাই। আপনার অন্তরের স্নেহ-প্রীতি দিয়া তাহার সমস্ত ফাঁকই যেন তিনি ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তারপর? তাঁহার মৃত্যুর পর রোকেয়ার জীবনের অবলম্বন বলিতে তো কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহার মনোভাব, মতিগতিও যেন তিনি ক্রমাগত সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দিনের পর

দিন চিন্তা করিতে করিতে পত্নীর ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য এক অভূতপূর্ব্ব পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় খেলিয়া গেল—যাহাকে রূপ দিতে পারিলে তাঁহার অবর্ত্তমানেও বুঝি তাহার জীবন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিতে পারে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন—তাঁহার অবর্ত্তমানে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করাই রোকেয়ার উপযুক্ত কাজ হইবে। ইহাতে শুধু যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার একটী উপলক্ষ পাওয়া যাইবে তাহা নয়—রোকেয়ার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন-সাধ সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ এবং জাতিরও অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

মিতব্যয়ী সাখাওয়াৎ সত্তর হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দশহাজার টাকা কেবল মাত্র কল্পিত স্কুল পরিচালনার জন্যই তিনি পত্নীকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যান। এভাবে স্বামীর জীবদ্দশাতেই রোকেয়ার ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

সাবধানী সাখাওয়াতের আশঙ্কা মিথ্যা হইল না। প্রিয়তমা পত্নীর ভবিষ্যতের পথ-নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এমন সময়ে একদিন পরপারের পরওয়ানা আসিয়া হাজির হইল। তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে ক্রমশঃ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল,

কিন্তু তাঁহার সেই সদানন্দভাব শেষ পর্য্যন্তও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

স্বামীর সাহায্য ও সহানুভূতি রোকেয়ার শিক্ষার পথে সহায়তা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সাখাওয়াৎ সরকারী লেখাপড়ার কাজে রোকেয়ার নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইতেন। শুধু তাহাই নয়। সাখাওয়াতের বাংলা শিখিবার আগ্রহ ছিল, একথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রোকেয়া নিজে বেহারী স্বামীকে বাংলা শিখাইবার ভার নিয়াছিলেন। এভাবে তিনি নিজের ঋণভার কিছুটা লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কালব্যাধির প্রকোপে সাখাওয়াতের দুইটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সাখাওয়াৎ চক্ষু হারাইলেন—সেই হইতে লেখাপড়ার ব্যাপারে স্ত্রীই হইলেন তাঁহার চক্ষু। রোকেয়া গভীর অনুরাগে স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসিয়া তাঁহাকে নানা বিষয় পড়িয়া শুনাইতেন।

অবশেষে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে সাখাওয়াৎ দেহত্যাগ করেন। একটী মহৎ অন্তর, মমতায়-ভরা একটী অমূল্য হৃদয়, ভূলোক হইতে দ্যুলোকে মহাপ্রয়াণ করিল। কিন্তু তিনি সত্যই মরিলেন কি? না, তাহা নয়। তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল—কিন্তু এখানেই সব শেষ হইল না। প্রেমময়ী পত্নীর জীবনে তিনি আবার নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন।

রোকেয়ার বিবাহ হইয়াছিল আঠার বৎসর বয়সে—বিধবা হইলেন তিনি আটাশ বৎসরে। মাত্র দশ বৎসরের বিবাহিত জীবন। এই সময়ের মধ্যে প্রিয়তম স্বামী তাঁহাকে অন্তরের উচ্ছলিত ভালবাসায় সিক্ত করিলেন—আবার ইহারই মধ্যে তাঁহার সকল দেনা-পাওনা কড়ায় কণ্ডায় মিটাইয়া দিয়া একেবারে পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন।

রোকেয়া আজ সংসারে একাকিনী। অভাব তাঁহার কিছুরই নাই। স্বামীর মৃত্যুতে নগদ টাকাই তিনি পাইলেন পঞ্চাশ হাজার। তাঁহার দাসদাসী আছে, বিষয়-সম্পত্তি আছে, রূপ-যৌবন আছে—কিন্তু সংসারের কঠিনতম বন্ধনটি তাঁহার আজ ভাগলপুরের মাটিতে সমাহিত। তাঁহার শোকার্ত্ত, উদাস মন বিহঙ্গের মত উড়িতে চাহিল। কিন্তু না, না—তাহা হইতে পারে না। তাঁহার সম্মুখে এক বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাক দেয়। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেই পথের দিশা স্থির হইয়া ছিল। নারী-জাগরণের যে-স্বপ্ন তিনি সঙ্গোপনে বহুদিন অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—সমস্ত প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া আজ সেই স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার সময় উপস্থিত। আর স্বামী? দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে প্রাণপ্রিয় স্বামী যে পর্ব্বত-প্রমাণ ঋণে বাঁধিয়া গিয়াছেন তাহাও পরিশোধের এই উপযুক্ত অবসর। পতিব্রতা পত্নী পণ করিলেন, নিজের কর্ম্ম-সাধনার

মধ্যে স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। শাহ্‌জাহান—প্রেমিক শাহ্‌জাহান ছিলেন রাজরাজেশ্বর। মণিমাণিক্যখচিত ধবলিত পাষাণে তিনি মহাসমারোহে দয়িতার স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিলেন। আর রোকেয়া অসহায়া অবলা; আপনার বুকের রক্তেও কি তিনি কালের কপোলে স্বামীর স্মৃতিলেখা ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারেন না? না, না, আর বিলম্ব নয়। দুঃসহ শোকের মধ্যেও তিনি চোখ মুছিয়া দৃঢ় পায়ে দাঁড়াইলেন।

সাখাওয়াতের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে পাঁচটী মাত্র ছাত্রী লইয়া ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তিপত্তন হইল। রোকেয়া বলিয়াছেন, 'তখনও আমি শোকের প্রচণ্ড আঘাত সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই।' জীবন-যৌবনের বাসন্তী উষায় ঐশ্বর্য্য-বিলাস পিছনে ফেলিয়া কুসুম-কোমলা নারী স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নিলেন কঠোর ত্যাগসাধনা। সম্মুখে জাগিয়া রহিল দারুণ বন্ধুর পথ—দিক্‌হীন, সীমাহীন!

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু রোকেয়া সংসার-অনভিজ্ঞা—চিরকাল কঠোর অবরোধের মধ্যে মানুষ। স্কুল-পাঠশালার ভিতরে তিনি কখনো পা দেন নাই। এখন স্কুল-পরিচালনার কাজ হাতে লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন—"প্রথম যখন পাঁচটী মেয়ে নিয়া স্কুল আরম্ভ করি তখন ভারী আশ্চর্য্য ঠেকিয়াছিল এই কথা—যে একই

শিক্ষয়িত্রী কেমন করিয়া এক সঙ্গে একই সময়ে পাঁচটী মেয়েকে পড়াইতে পারেন।" এমনই অনভিজ্ঞতা নিয়া সদ্য-বিধবা রোকেয়া প্রথম কাজে নামিয়াছিলেন।

এই সময়ে পরলোকগত স্বামীর পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও তাঁহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। সাখাওয়াতের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত একটী কন্যা ছিল, একথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। সাখাওয়াৎ জীবদ্দশায় সে কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ দেন। এখন পিতার মৃত্যুর পর সে সুযোগ দেখিল। সংসারের কর্ত্তৃত্ব, টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়া কন্যা-জামাতা উভয়ে রোকেয়ার সঙ্গে নানা দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিল। রোকেয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নি হোমেরা এ সময়ে তাঁহার কাছে ছিলেন। ভগ্নির সাহায্যে তিনি সপত্নী-কন্যা ও জামাতার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

পরলোকগত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদুল মালেক তখন ভাগলপুরে। তাঁহার অজস্র সহানুভূতি এই সময়ে রোকেয়াকে যথেষ্ট শক্তি ও সাহস যোগাইয়াছিল। অতঃপর আরও কয়েক মাস তাঁহাকে ভাগলপুরে থাকিতে হয়। কয়েক মাস পরে রোকেয়া তাঁহার বিবাহিত-জীবনের পুণ্যতীর্থ ভাগলপুর চির-দিনের মত ছাড়িয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলও কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।



কয়ার ভ্রাতা



রোকেয়ার পিতা

কলিকাতা

১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ। একটী অসহায়া বিধবা ভাগলপুর হইতে আসিয়া কলিকাতার কোলাহল-মুখরিত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাংলার নিপীড়িত মুস্লিম নারীর ভাগ্যাকাশে সকলের অলক্ষ্যে সেদিন নবীন ঊষার সূচনা হইল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র গলিতে আটটি মাত্র ছাত্রী লইয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের কাজ শুরু হইয়াছিল। বিধাতা রোকেয়াকে শক্তি ও সাহস দিয়াছিলেন অফুরন্ত। তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায় কলিকাতার কয়েকটী বিরাটপ্রাণ মানুষ পরলোকগত ব্যারিষ্টার মিঃ আবদুর রসুলের গৃহে সমবেত হইলেন। স্কুল পরিচালনার কাজে রোকেয়াকে সাহায্য করিবার জন্য এভাবে একটী কমিটি গঠিত হইল।

এই সময় হইতে রোকেয়ার জীবন ও স্কুলের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সমাজের ভবিষ্যত জননীদিগের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতে লইলেন। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার দায়িত্বও

সম্পূর্ণ তাঁহারই উপর। জাগরণের বাণী বহন করিয়া তিনি দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিলেন, কেহ তাঁহাকে বরণডালায় নন্দিত করিল না। বরং তাঁহার উপর বর্ষিত হইল তীব্র হইতে তীব্রতর আঘাত। কিন্তু রোকেয়ার জীবন সৈনিকের জীবন। আঘাতের ভয়ে পিছাইলে চলিবে কেন? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার মাথার উপর দিয়া প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না, স্থির অকম্পিত চরণ ফেলিয়া দিনের পর দিন সম্মুখেই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

যে গৃহে আটটি ছাত্রী ও দু'খানি বেঞ্চি লইয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের কাজ শুরু হইয়াছিল, দুই বৎসর পরে আর সেই ছোট ঘরখানিতে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না। তৃতীয় বৎসরে যখন স্কুল নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইল, তখন ছাত্রী সংখ্যা চল্লিশ। স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই বলি, আর শিক্ষয়িত্রীই বলি—রোকেয়া একাই সব। আর দু'একজন সহকারী শিক্ষয়িত্রী নিম্ন শ্রেণীর কাজ চালান। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীরাই অবসর সময়ে নিম্ন শ্রেণীর কাজে সাহায্য করে। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শুধু অর্থাভাবই নয়—উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবও রোকেয়াকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভিতরে যে শুধু ছাত্রীদিগকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান

করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য 'জগত ছানিয়া কি দিব আনিয়া'—এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, আরা, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"

রোকেয়া নিজেও স্কুলের নিয়মকানুন, ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞা। তিনি দেখিলেন, সুচারুরূপে স্কুলপরিচালনা করিতে হইলে তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাঁহার শক্তি ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তিনি কলিকাতার ইংরেজ, বাঙালী, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলসমাজের অভিজ্ঞ, কর্ম্মদক্ষ মহিলাদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মত অমায়িক, উদার, জ্ঞানপিপাসু মহিলা সকলের কাছে সমান আদর পাইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস রাজকুমারী দাস প্রভৃতি শিক্ষাবিশেষজ্ঞ মহিলাদের সহানুভূতির ফলে তিনি কলিকাতার বিখ্যাত বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের আভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলেন। এই সময় দিনের পর দিন স্কুলের ছাত্রীর মত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তিনি ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল ও অন্যান্য স্কুল সমূহে যাতায়াত করিয়াছেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়া স্কুল পরি-চালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের গভীরতায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের চেয়ে কম ছিলেন না; বরং অনেক সময় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আধুনিক কালের গ্রাজুয়েটদের বিদ্যার পরিমাণ দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন। কতবার তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—"এরা যা-ইংরেজী বা বাংলা লেখে, আমাদের মতো মুখ্যু সুখ্যু লোকের চোখেও তার ভুল ধরা পড়তে বাকী থাকে না।"

ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় রোকেয়ার অসাধারণ দখল ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী নহেন বলিয়া স্কুলের কাজকর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে তাঁহাকে অনেক বাধা পাইতে হইত। তিনি অনেক সময় বলিতেন—"আমি তো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ-মারা নই! গাধার খাটুনিই আমি খাটি! আধুনিক কালের উপাধিধারিণী শিক্ষয়িত্রীদের দেখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের ভালমন্দ বিচার করেন।" কথাগুলি বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে তিনি গল্প করিতেন, এই বিষম অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্কুলের প্রথম জীবনে তিনি কতবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সপ্তাহের ঝঞ্চাট চুকাইয়া প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে তিনি মিসেস রাজকুমারী দাসের কাছে কিছুদিন ধরিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পাঠগ্রহণ করিতে যাইতেন। গণিত

লইয়াই তাঁহার মুশকিল হইত সকলের চেয়ে বেশী। একবার মিঃ রেজাউর রহ্‌মান খানকে কিছুদিনের জন্য রোকেয়ার শিক্ষকতা করিতে হইয়াছিল। মিঃ খান তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলেজ হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহ বিকালে কিছুক্ষণ তিনি রোকেয়াকে গণিত শিক্ষা দিতেন। কিন্তু রোকেয়ার মত ছাত্রীর শিক্ষকতা করা বড় সোজা কথা নয়। রোকেয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে শিক্ষককে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটী প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া কঠিন হইত, শিক্ষক কষ্টে অব্যাহতি পাইতেন।

এদিকে ধীরে—অতি ধীরে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উন্নতি হইতে থাকে। স্কুলের দীর্ঘকালের জীবনে ইহাকে বহু আপদ-বিপদ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথম হইতেই একশ, দু'শ বা ততোধিক ছাত্রী লইয়া ইহার কাজ শুরু হয় নাই; দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যে ইহাকে হাই স্কুলের শ্রেণীতে উন্নীত করিতেও পারা যায় নাই। প্রথম প্রথম একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রীদিগকে শিক্ষা-দান করা হইত, তবুও বৎসরের পর বৎসর দেখা যাইত, ছাত্রী-সংখ্যা তেমনই রহিয়াছে। পরিপূর্ণ দুইটী যুগ ধরিয়া একটী অবলা নারী তিল তিল করিয়া আপনার হৃদয়রক্তে ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

রোকেয়া বলিয়াছেন "টাকা উপার্জ্জন করাই যে শিক্ষা-

লাভের মূল উদ্দেশ্য ইহা আমি কোনকালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য : মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বি. এ., এম. এ. পাশ করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য হওয়া উচিত। সাদী বলিয়াছেন—'শিক্ষা না পাইলে লোকে স্রষ্টাকেও চিনিতে পারে না।' যে সকল মোল্লা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়, তাহারা ছদ্মবেশী শয়তান।"

একবার স্কুলের ছাত্রীদের তিনি শিক্ষার কথা বলিতে গিয়া একটী সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"তোমরা জান যে শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সে চিরকাল মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর থাকে। শয়তানই আমাদের দ্বারা পাপ করায়। শয়তানের অসংখ্য চেলা সমস্ত দিন মানবের দ্বারা যেসব পাপ করায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় শয়তানের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিয়া থাকে। একদিন কতকগুলি চেলা আসিয়া নানাবিধ পাপের রিপোর্ট দিল; শয়তান নীরবে শুনিতেছিল। শেষে যখন এক চেলা বলিল যে সে এক ছাত্রের পড়া ভুলাইয়া দিয়াছে, তাহাকে শয়তান কোলে লইয়া খুব আদর করিল। তাহা দেখিয়া অপর চেলারা হিংসা করিয়া বলিল, আমরা এত কঠিন কঠিন পাপ, নরহত্যা পর্য্যন্ত করাইলাম—তবু আমাদের অত আদর হইল

না ; ও' সামান্য একটা ছেলের পড়া ভুলাইয়া দিয়াছে, সেই জন্য ওকে কোলে লইয়া চুমা দেওয়া হইল। ইহা কি অবিচার !" তদুত্তরে শয়তান বলিল, "তোমরা বুঝ না, তাই এরূপ বল। মূর্খতা, অজ্ঞতা হইল সমস্ত পাপের মা-বাপ। মানুষ যত মূর্খ থাকে ততই তাহাদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিজ্ঞলোকের বিরুদ্ধে আমাদের কোন প্রকার শয়তানী খাটেনা। অতএব তোমরা সকলে প্রাণপণে চেষ্টা কর, মানুষকে মূর্খ রাখিতে !"

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া রোকেয়া বলিয়াছেন—"মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ-জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার-ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।"

কলিকাতায় স্কুলের কাজ আরম্ভ করিবার অল্পদিন পরে রোকেয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে ভূপালের মহামান্যা বেগম সুলতান জাহান সাহেবার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া বেগম সাহেবা রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা ও উচ্চ আদর্শের সহিত পরিচিত হন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সহানুভূতি ও উৎসাহসূচক পত্র লেখেন।

শুধু ভূপালের বেগমই নন, রোকেয়ার মহান উদ্দেশ্য, অসাধারণ শক্তিসাহস ও ত্যাগসাধনা আরও অনেককেই আকর্ষণ করিয়াছিল। একেবারে অপরিচিত ভাবে অনেক সমাজহিতৈষী মানুষ রোকেয়ার আহ্বানে আসিয়া সাড়া দিয়াছিলেন।

মনীষী মোহাম্মদ আলী এই সময় কলিকাতা হইতে 'কমরেড' বাহির করিতেন। তাঁহার কন্যা ছিল সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রী। বিপদ-আপদে সকল সময় মৌলানা মোহাম্মদ আলীকে রোকেয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত,—বোম্বাই হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড হইতে কচিৎ এক একটী মহাপ্রাণ মানুষের দানের হস্ত একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এই অবলা নারীর সাহায্যের জন্য প্রসারিত হইয়াছে। কচিৎ এক একজন অজ্ঞাতনামা মানুষ আগাগোড়া নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অযাচিত ভাবে অন্তরাল হইতে রাশি রাশি অর্থে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলকে পুষ্ট করিয়াছেন, এমনও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

একবার এক নববিবাহিত তরুণ-তরুণী তাঁহাদের বিবাহের সমস্ত যৌতুক—টাকাপয়সা ও দ্রব্যসামগ্রী স্কুলের উন্নতির জন্য হাসিমুখে দান করেন।

স্কুলের প্রথম জীবনের সংগ্রামের ইতিহাসে এরূপ নিঃস্বার্থ

আত্মত্যাগ অনেক সময় রোকেয়ার চলার পথে রশ্মিসম্পাৎ করিয়াছে। এই শ্রেণীর মহানুভব মানুষ হয়ত সংখ্যায় মুষ্টিমেয়; কিন্তু ইঁহাদেরই দরদী মনের স্পর্শ রোকেয়া নিয়ত নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, ইঁহারাই উজ্জ্বল তারকার মত তাঁহাকে কালরাত্রির অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন।

নিজের অক্লান্ত সাধনার ফলে রোকেয়া যে সকল খ্যাতনামা মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ আবদুল করীম জামাল, বোম্বাইয়ের মিঃ বি. এম. মালাবারি, মিঃ জাষ্টিস সৈয়দ শরফুদ্দীন, সৈয়দ হাসান ইমাম, নবাব সিরাজুল ইস্‌লাম, মিঃ আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহীম, নবাব শামসুল হুদা, নবাব নবাব আলী চৌধুরী, নবাব বদরুদ্দীন হায়দর, মৌলবী আবদুল করীম, মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, ও মৌলবী মুজিবুর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্রমে গভর্ণমেণ্টেরও সহানুভূতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল গভর্ণমেণ্ট হইতে নিয়মিত অর্থসাহায্য পাইতে লাগিল। তদানীন্তন বড়লাটপত্নী লেডী চেমস্‌ফোর্ড ১৯১৭ সনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল পরিদর্শন করেন। সেই অন্ধকার যুগে একটী মুস্‌লিম নারীর সাধনা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল তখন মধ্যইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

মাকড়-মাতা

রোকেয়া একদিন কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "ক্ষুদ্র জীব মাকড়সা তাহার নিজের বুকের রক্তে শত শত মাকড়-শিশুকে নূতন জীবন দেয়; আর আমরা মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আমরা কি কেহ এইরূপ একটী প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত শত মুস্‌লিম নারীর মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিতে পারি না?" সমগ্র জীবন দিয়া তিনি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন—"হাঁ, পারি।"

একবার স্কুলের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা এই দোতলা বাড়ীটা দেখিতেছ, কিন্তু ইহাকে গঠন করিতে কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, কত মজুব-মিস্ত্রী ভারা হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা তোমরা অনুমান করিতে পার কি? ইহার অসংখ্য ইটের জন্য কত মাটি পুড়িয়াছে, সুরকীর জন্য কত ইট নিজকে চূর্ণ করিয়াছে, কপাট চৌকাঠের জন্য কত বড় বড় গাছ করাতকাটার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, ইমারতের চূণ তৈয়ার করিবার জন্য কত ঝিনুক প্রাণ দিয়াছে—তাহা তোমরা ধারণা করিতে পার কি?" এই সামান্য কথা কয়টিতে আমরা তাঁহারই সর্ব্বস্বত্যাগের স্পষ্ট আভাস দেখিতে পাই।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন "তোমরা এখন বড় হইয়াছ। কিন্তু তোমাদের বড় করিয়া তুলিতে তোমাদের মাতাকে কত ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কতখানি রক্তে এক ফোঁটা স্তন্যদুগ্ধ তৈয়ার হইয়াছে, তোমাদের অসুখের সময় মাতা কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন—তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যখন মা তোমাদিগকে স্নান করাইয়া তেল মাখাইয়া, চোখে কাজল দিয়া, দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া নিজে হাত মুখ ধুইয়া একটু কিছু খাইতে বসিয়াছেন, ঠিক সেই সময় তোমরা কান্না জুড়িয়া দিয়াছ! বেচারী অমনি মুখের গ্রাস ফেলিয়া দৌড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছেন!

"তোমরা হয়তো জান না সেইরূপ এই স্কুল স্থাপনের নিমিত্ত কোন লোককে নিজের বাড়ী ঘর, আত্মীয়-স্বজন—সব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনেক সময় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বুকের কত রক্ত জল করিতে হইয়াছে, প্রায় ত্রিশ হাজার নগদ টাকা হারাইতে হইয়াছে।

"এক সময় রবিবারে স্কুল কমিটির একটী মিটিং হইবার কথা ছিল। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্কুলের সেক্রেটারী উক্ত মিটিং সংক্রান্ত কতগুলি জরুরী কাগজ লইতে আসিয়া শুনিলেন, তোমাদের সেই দীনতমা সেবিকার মাতার মৃত্যু হইয়াছে—লাশ তখনও ঘরে। তিনি নীরবে ফিরিয়া গেলেন, আর ভাবিলেন যে মিটিংটা পণ্ড হইল। পরদিন মাতার

দাফনক্রিয়া শেষ হওয়ামাত্র সে সর্ব্বপ্রথমে সেই কাগজগুলি সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল।”

স্কুলপরিচালনার কাজে সহকর্ম্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথাও রোকেয়া এই প্রসঙ্গে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ “একবার স্কুলের প্রাইজের আয়োজন সমস্ত ঠিক। সেই সময় সেক্রেটারী সাহেব খবর পাইলেন যে দেশে তাঁহার নওজোয়ান ভাই রোগশয্যায় পড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তিনি দেশে গেলেন না। পরে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার ভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু সেক্রেটারী সাহেব স্কুলের খাতিরে কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন না। এজন্য তাঁহার পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়-স্বজনের নিকট তাঁহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল।

“আর একবারের ঘটনা। স্কুলের প্রাইজউৎসব হইতেছিল। তদানীন্তন গভর্ণরের পত্নী লেডী কারমাইকেল পুরস্কার বিতরণ করিতেছিলেন। সেই সময় সেক্রেটারী সাহেব টেলিগ্রাম পাইলেন যে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণের চেষ্টা করিতেছিলেন আর অপেক্ষা করিতেছিলেন কতক্ষণে লেডী কারমাইকেল বিদায় হইবেন। অতঃপর হাস্যমুখে লেডী কারমাইকেলকে বিদায় করিয়া তিনি স্ত্রী ও কন্যাদের লইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন।”

পরিশেষে বড় দুঃখে রোকেয়া বলিতেছেন—“স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের

এই সব মহান ত্যাগের কি কোন মূল্য নাই? ইহার বিনিময়ে আমরা এযাবত সমাজের নিকট কি পাইয়া আসিয়াছি? কেবল অভিযোগ, অনুযোগ, নালিশ ও ফরিয়াদ।

("আজ চব্বিশ বৎসর সমাজসেবা করিয়া অমি এইটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে মুসলমান সমাজটা নিতান্ত অভিশপ্ত, আর যে ব্যক্তি ইহার কল্যাণকামনা করিবে সে নিতান্ত হতভাগ্য।) গরীবের কথার একটা মস্ত প্রমাণ—কাবুলের মহামান্য বাদশাহ্ আমানুল্লার সিংহাসনত্যাগ। আফগানিস্থান অধঃপাতে যাক, ব্যক্তিগত ভাবে বাদশাহ্ নামদারের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; অধঃপতন হইবে সমগ্র আফগান জাতির।"

দুর্ভাগ্য সমাজ রোকেয়াকে চিনিতে পারে নাই। যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন—কলিকাতার সমাজে প্রথম সময় এ কথা প্রায়ই শোনা গিয়াছে। স্কুল স্থাপনের অষ্টাদশ বৎসর পরে সমাজের নানা বিরুদ্ধতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া রোকেয়া বলিয়াছেন: "এই আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক—যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কতপ্রকার ষড়যন্ত্র

চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লা জানেন—আর কিছু কিছু এই দীনতম সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পায়। একমাত্র ধর্ম্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।”

“স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাবাত, এত শিলাবৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট। একথা বলি না যে আমরা সমাজের সম্মুখে অতি উচ্চদরের এক অদ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যালয় উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহাই করিয়াছি এবং অবরোধবন্দিনী বালিকাদের পক্ষে যতটা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব তাহাই তাহারা পাইয়াছে।”

জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত রোকেয়া স্কুলপরিচালনার কাজে অবরোধের অত্যাচার কতটা সহিয়াছেন দুএকটা ঘটনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

তিনি বলিয়াছেন—“আজিকার (২৮শে জুন, ১৯২৯) ঘটনা। স্কুলের একটী মেয়ের বাপ লম্বা চওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে মোটর ‘বাস’ তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে বোরকা পরিয়া চাকরাণীর সহিত হাঁটিয়া বাড়ী আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে একব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাঁহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের এক শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে

বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দ্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই:—'অনুসন্ধানে জানিলাম হীরার বোরকায় চক্ষু নাই। অন্য মেয়েরা বলিল, তাহারা গাড়ী হইতে দেখে চাকরাণী প্রায় হীরাকে কোলের কাছে লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। বোরকার চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল। কখনও হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।' দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র নয় বৎসর—এতটুকু বালিকাকে 'অন্ধ বোরকা' পরিয়া পথ চলিতে হইবে! ইহা না হইলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না!"

অন্যত্র তিনি লিখিতেছেন—"কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,

'কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন।'

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর বাস প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈক শিক্ষয়িত্রী, মেমসাহেবা মিস্ত্রীখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার—'না বাবা, আমি কখনো মোটরে যাব না।' বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল, বাসের পশ্চাতের দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখ

দিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই টুকরা না থাকিলে বাসখানাকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যাইতে পারিত।

প্রথম দিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ী পৌঁছান হইল। চাকরাণী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ী বড্ড গরম হয়,—মেয়েরা বাড়ী যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল। কেহ কেহ বমি করিয়াছিল। ছোট মেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

"দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটর পাঠাইবার সময় উপরোক্ত মেম সাহেবা মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙীন কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি স্কুলে আসিলে দেখা গেল, দু'তিনজন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই চারিজন বমি করিয়াছে, কয়েকজনের মাথা ধরিয়াছে ইত্যাদি। অপরাহ্নে মেম সাহেবা, বাসের দু'পাশের দুইটী খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দ্দা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

"সেদিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জ্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আপনাদের মোটর বাস তো বেশ সুন্দর হয়েছে! প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে আলমারী যাচ্ছে নাকি—চারিদিক একেবারে

বন্ধ, তাই বড় আলমারী বলে ভ্রম হয়! আমার ভাইপো এসে বল্লে ও পিসীমা! দেখ' এসে, Moving Black hole ('চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে! তাইতো, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কি করে ?'

"তৃতীয় দিন অপরাহ্নে চারি পাঁচজন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন—'আপ্‌কা মোটর তো খোদাকা পানাহ্‌! আপ লাড়কীয়োঁ কো জীতে জী কবর মে ভর রহি হ্যাঁয়।' আমি নিতান্ত অসহায় ভাবে বলিলাম, 'কি করি, এরূপ না হইলে ত আপনারাই বলিতেন—বেপর্দ্দা গাড়ী।' তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'তব্‌ কেয়া আপ জান মারকে পর্দ্দা করেঙ্গী? কাল সে হামারা লাড়কীয়াঁ স্কুল নেহী আয়েঙ্গী।' সেদিনও দুতিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটর বাসে আসিবে না।

"সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানাহীন ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজীচিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন 'Brother-in-Islam', বাকী তিনখানা উর্দ্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর চতুর্থখানায় পাঁচ জনের স্বাক্ষর। সকল পত্রের বিষয় একই—সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ-কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ী বেপর্দ্দা করে। যদি আগামী কল্য পর্য্যন্ত মোটরে

ভাল পর্দ্দার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিস' 'পলিদ' প্রভৃতি উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন এরূপ বেপর্দ্দা গাড়ীতে কি করিয়া মেয়ে আসে।"

বড় দুঃখে রোকেয়া বলিয়াছেন "এতো ভারী বিপদ! 'না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।' রাজার আদেশে একদিন নয়, দুদিন নয়—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর বোধ হয় কেহ এমন করিয়া জীবন্ত সাপ ধরিতে পারে নাই।"

পঁচিশ বৎসর আগে—পঁচিশ বৎসর আগেই বা বলি কেন, এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছেন যাঁহারা স্কুলে মেয়ে পাঠানোকে একটা মস্ত বড় পাপের কাজ বলিয়া মনে করেন। যিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছেন 'আমি রোকেয়াকে ধন্য করিলাম।' আর যিনি নানা ছল ছুঁতায়, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের পান হইতে চূণ খসিবার অপরাধে মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তিনি মনে করিয়াছেন —'বিরাট শাস্তি দিলাম রোকেয়াকে!' স্কুলে মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চা করিবার, গান বাজনা শিখিবার বন্দোবস্ত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পরদিন হইতে শুরু হইল উর্দ্দু কাগজসমূহে স্কুলের শ্রাদ্ধ, স্কুল পরিচালিকার সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ!

রোকেয়া নিজে কোনকালেই অনাবশ্যক পর্দ্দার আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি

এই ব্যাপারে নিজের বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারেন নাই। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে ছাত্রীর অভাব তখন আর ছিল না, কিন্তু তাহাদের অভিভাবকগণ তখনো অবরোধের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। স্কুলের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া রোকেয়া এই ব্যাপারে সমাজের সবচেয়ে গোঁড়া মানুষদের মতামতকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন না। এজন্য তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইত; কিন্তু তিনি যদি এত সতর্কভাবে অগ্রসর না হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল বহুদিন আগেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

স্কুল কমিটিতে রোকেয়া বাহির হইতেন না। কমিটিতে প্রায় সবই পুরুষ মেম্বর। অন্তরাল হইতে তিনি তাঁহাদিগকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিতেন। তিনি গল্পচ্ছলে একবারের ঘটনা বলিয়াছেন—যে ঘরে আলমারীর মধ্যে তিনি জরুরী কাগজ পত্র রাখিতেন স্কুলের সেই কক্ষেই কমিটির মিটিং বসিয়াছিল। নানাবিধ আলোচনার মধ্যে হঠাৎ আলমারীর মধ্য হইতে একটী কাগজের দরকার পড়িয়া যায়। পর্দ্দানশীন রোকেয়া ও পুরুষ মেম্বরদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিবার জন্য একজন অমুসলমান শিক্ষয়িত্রী মিটিংয়ের সময় হাতের কাছে থাকিতেন। কিন্তু তিনি সেদিন কিছুতেই দরকারী ফাইলটি আলমারীর মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। উপস্থিত

ভদ্রলোকেরাও গলদঘর্ম্ম হইলেন—কাগজ বাহির হইল না। এদিকে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে রোকেয়া প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ফাইলটি কোথায় রাখিয়াছেন। এভাবে অনেক সময় অনেক কাজ পণ্ড হইত।

রোকেয়া বলিয়াছেন, "স্কুলের অনিষ্ট করিতে কতগুলি লোক বদ্ধ-পরিকর আছেন। কোন কারণে আমার প্রতি কেহ বিরক্ত হইলে তিনি আমার অনিষ্ট কামনায় এই স্কুলের অনিষ্ট করিয়া বসেন! আমি নিজে এমনই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছি যে আমার অনিষ্ট কেহ করিতে পারে না। কারণ 'ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।' লোকে আমার কি করিবে? আমার মেয়ের বিবাহ পণ্ড করিবে? আমার ছেলের বিবাহে ভাংচি দিবে? আমার নিজের পার্থিব কি আছে যাহা কেহ নষ্ট করিবে? বরং স্কুলের পতন হইলে সংসারে যেটুকু মায়ার বন্ধন আছে আমি তাহা হইতেও মুক্তি লাভ করিব। বলিয়াছি, একমাত্র ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমি জীবনের শেষ দিনে এই ভাবিয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিব যে এই স্কুল-পরিচালনার ব্যাপারে আমি নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য একটী মিথ্যা কথা বলি নাই—এবং স্কুলের একটী পয়সা নিজে ভোগ করি নাই।"

স্কুলের পয়সা ভোগ করাতো দূরের কথা, স্কুলের উন্নতির জন্য রোকেয়া নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে কত রাশি রাশি

অর্থ যে ঢালিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দশ হাজার টাকা লইয়া স্কুল আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়াও সময় সময় তাঁহাকে বার্ষিক হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্কুলের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে। স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁহার একটী নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল। কিন্তু সেই সামান্য পারিশ্রমিকেরও সমস্ত তাঁহাকে স্কুলের কাজেই ব্যয় করিতে হইত।

স্কুল স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া স্কুলের প্রায় দশ হাজার টাকা নষ্ট হয় এবং নানা কারণে আরও প্রায় বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। নিজের ব্যক্তিগত অর্থ হইতে রোকেয়া এই টাকার ক্ষতিপূরণ করেন। তাহা না হইলে সেই সুদূর অতীতেই বোধ হয় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

ব্যাঙ্ক ফেলের পরে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। তদানীন্তন সেক্রেটারী, অক্লান্তকর্ম্মী মিঃ সৈয়দ আহমদ আলী এই সময় রোকেয়াকে লিখিয়াছিলেন, "পরাজয় অবশেষে আসিল। কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্য দিয়া আসিল, ইহাই দুঃখ।" আর একবার তিনি স্কুলের আর্থিক দুরবস্থার সময় মনের আবেগে লিখিয়াছিলেন—"চারিদিক অন্ধকার। কোনদিকেই আলোর আভাস দেখা যায় না। আমার যতটুকু সামর্থ্য তাহার চেয়ে এক বিন্দুও

কম করি নাই, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইল? সমাজ প্রতি পদে বাধা দিয়াছে, স্বয়ং বিধাতাও প্রতিকূল। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম।” কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিবার জন্য রোকেয়ার জন্ম হয় নাই ; একান্ত অভাবনীয় বিপদেও তিনি কখনো সাহস হারান নাই।

স্কুলের আঠার বৎসর বয়সে তিনি বলিয়াছেন—“একটা মজার কথা এই যে স্কুলের জন্য আমি পার্থিব যে কোন জিনিসের প্রতি নির্ভর করিয়াছি, আল্লা আমাকে তাহাই হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমার মাতা সঙ্গে না থাকিলে আমার কলিকাতায় থাকা হইবে না। কিন্তু বৎসর অতীত হইতে না হইতে মাতার মৃত্যু হইল। পরে ভাবিয়াছিলাম টাকা না থাকিলে স্কুল চলিবে না ; কিন্তু বিদ্যালয় খুলিবার আট মাস পরেই বার্ম্মা-ব্যাঙ্ক ফেল হইল, অতঃপর আরও নানা কারণে একুনে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা নষ্ট হইল। তাহার পরে ভাবিয়াছিলাম কলিকাতার কতিপয় গণ্যমান্য রইসের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলে বিদ্যালয়-সহ কলিকাতায় টিকিয়া থাকিতে পারিব না ; কিন্তু সেই গণ্য-মান্য লোকেরাও বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। সবই গিয়াছে, কেবল বিধাতার কৃপায় স্কুল আছে। শুধু কঙ্কালসার হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা নহে—বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছিলাম মাত্র দুখানা বেঞ্চ এবং আট জন ছাত্রী লইয়া অলিউল্লা লেনের

একটী ছোট বাড়ীতে, এখন স্কুলের প্রায় ঝাড়া আঠার উনিশ হাজার টাকার আসবাব এবং নগদ বিশ হাজার টাকা আছে, ছাত্রীসংখ্যাও শত্রু-মুখে ছাই দিয়া দেড় শত। আমরা তোমারই উপসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি—কোরাণ শরীফের এই বচনটীই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।"

মাকড়সা-জননী এভাবে দিনের পর দিন আপনার বক্ষঃ রক্তে শত শত মাকড়-শিশুকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মুস্লিম বঙ্গে নারী-আন্দোলন

বাংলার মুসলমান মেয়েদের সামাজিক জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় গত বিশ বৎসরে তাঁহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশ বৎসর আগে যাঁহারা গৃহের চারি প্রাচীরের ভিতর হইতে বাহিরে আসাকে ঘোর পাপের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাই আজ রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বিলাত পর্য্যন্ত দরবার করিতেছেন। সমাজের যে দিকেই তাকানো যায়, দেখা যাইবে আজিকার মুস্লিম নারী-সমাজে সমস্ত ব্যাপারে একটা নূতন চাঞ্চল্য ও উৎসাহের লক্ষণ জাগিয়াছে। সমস্ত বিষয়েই অনুভব করা যায় যে আমরা উন্নতির যুগে বাস করিতেছি, আমাদের চারিদিকে সমাজের চেহারা দিনে দিনে বদলিয়া যাইতেছে, দেশের মেয়েদের অভাব আকাঙ্ক্ষা সব কিছুতেই একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন আসিতেছে।

কিছুদিন আগে দমদম হইতে বিমান-পোত-চালনা শিক্ষার জন্য যে দাস-রায় মেমোরিয়াল বৃত্তি ঘোষণা করা হয়, মুসলমান মেয়েরা তাহাতে পর্য্যন্ত প্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা আজ দায়িত্ব-পূর্ণ সরকারী কাজে, হাইকোর্টের এডভোকেট হিসাবে এবং আরও নানাভাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্রীর অভাব নাই। মুসলমান মহিলারা

স্কুল স্থাপন করিতেছেন, স্কুল পরিচালনা করিতেছেন, সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সমিতির মধ্য দিয়া সমাজসেবায় দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। শুধু কলিকাতায় নয়, কলিকাতার বাহিরেও বহু বালিকা স্কুল, গার্লস্ হোম বা মহিলা সমিতি আছে, যাহার মূলে রহিয়াছে মুসলমান মেয়েদেরই সাধনা।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়া মুসলমান বালিকারা হিন্দু বালিকাদের চেয়েও অনেক অগ্রসর।

বাংলার মিউনিসিপালিটিতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রথম যে মেয়ে মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তিনি মুসলমান।

জাগরণের এই আলোকময় প্রভাতে আজ সকলের আগে যাঁহাকে মনে পড়ে, তিনি আর কেহই নহেন—বাংলার মুসলমান নারী-আন্দোলনের জন্মদাত্রী, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রদূত মিসেস্ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়ন। আমরা জানি, ইংরেজের আমলে মুসলমান নারীদিগকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্য হইতে আলোকের পথে টানিয়া আনিবার প্রথম চেষ্টা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আলোকের দূতী বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময়ে আর কয়েকটী যুবক নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া নীরবে মুসলমান মেয়েদের চলার পথ সুগম করিবার জন্য

আপ্রাণ সাধনা করিতেছিলেন। পাঠ্যজীবনে ইঁহাদের চেষ্টায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় সুহৃদ সম্মিলনী নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারই মধ্য দিয়া ইঁহারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে উদার মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। যে নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশ জুড়িয়া স্কুল-কলেজে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক সেই নিয়মে ইঁহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের মেয়েদের জন্য গৃহে গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। *

কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল সেদিন, যেদিন আলোকের দূতী রোকেয়ার অপূর্ব্ব প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল! আমাদের জীবনে মধ্যাহ্ন এখনো আসে নাই। কিন্তু আঁধারের বুক চিরিয়া যে-নারী আলোক-শিশুকে বাঁচাইয়া আনিলেন, মধ্যদিনে তাঁহার উদ্দেশে আমাদের হাতের জয়পতাকা নিশ্চয়ই অবনত হইবে।

গভীর অন্ধকারে রোকেয়া শিক্ষার মঙ্গলদীপ জ্বালিলেন; সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিবার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে মুস্‌লিম নারীদের সামাজিক জীবন গঠন

* এই অক্লান্ত কর্ম্মী, নারীহিতৈষী যুবকদিগের মধ্যে নোয়াখালীর মৌলবী আবদুল আজীজ, মৌলবী ফজলুল করীম, মৌলবী বজলুর রহীম ও বরিশালের মৌলবী হেমায়েৎ উদ্দীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মুস্‌লিম-বঙ্গে সকলের আগে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদেরই মধ্যে কয়েকজন।

করিয়া তুলিবারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বা মুস্‌লিম মহিলা সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই মহিলা সমিতি। এই সমিতির ইতিহাসের সহিত তাঁহার বিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আঞ্জুমনের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্ম্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।

আঞ্জুমনে খাওয়াতীন তাহার এই দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করিয়াছে, তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়,—অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্তা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতার মুসলমান নারী-সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর

আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।

প্রারম্ভে এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেন তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতই না হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিবেন একথা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া তিনি তাঁহাদের মুখের ঘোমটা খসাইলেন, হাত ধরিয়া ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন।

কোথাও হয়ত বন্দিনী নারী রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তখনই মনে পড়িয়াছে অভিভাবকের রোষকষায়িত-লোচন। রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে তখন তিনি সভার নির্দ্দিষ্ট তারিখে কোন নিকট-আত্মীয়ের গৃহে যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে পুঁটলিতে রহিয়াছে সভায় যোগদান করিবার উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ। এভাবে হতভাগিনীদের শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টায় রোকেয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।

একাকী অন্ধকার-পথে কত নিন্দা-গ্লানি, কত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইয়াছে, তাঁহার একটী মাত্র

কথায় তাহার সবখানি আমাদের চোখের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তাঁহার শেষ জীবনে যখন আমাকে এই সমিতির কাজে হাত দিতে হইয়াছিল, তখন একবার বাহির হইতে অকারণে সামান্য বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলাম, সে সময় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই একটী কথায় তাঁহার জীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই একটী মাত্র কথার মধ্যে যেন আমরা এক নিমেষে তাঁহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিয়া পাই! বাস্তবিকই চিরদিন তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ও মস্তকের আবরণে কেবলই আঘাতের পর আঘাত বর্ষিত হইয়াছিল। উদগ্র কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া চিরদিন দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

সভাসমিতি কাহাকে বলে অনেক স্থলে তাহাও রোকেয়াকে অনেক কষ্টে শিখাইতে হইত। তিনি গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন— একবার অনেক সাধ্যসাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া একটী শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মহিলাকে আঞ্জুমনের এক মিটিংয়ে আনা গেল। যথাসময়ে মিটিংয়ের

কাজ শেষ হইল। সমবেত মহিলারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় নবাগতা মহিলাটি রোকেয়ার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'সভার নাম করিয়া বাড়ীর বাহির করিলেন, কিন্তু সভা তো দেখিতে পাইলাম না!' রোকেয়া অনেক কষ্টে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, এখনই যে-কাজ শেষ হইয়া গেল তাহারই নাম সভা।

রোকেয়া বলিতেন, 'যে কক্ষে সভা বসিত প্রত্যেকটী অধিবেশনের পর তাহার দেওয়ালগুলি পানের পিকে এমন রঞ্জিত হইয়া যাইত যে, প্রত্যেক বারেই চূণকাম না করাইলে চলিত না।'

স্বয়ং সভানেত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সমাগত মহিলাদের মধ্যে কেহই অনুভব করিতেন না, যে-সময় সভার কাজ চলিতেছে অন্ততঃ সে-সময়টুকু নিজ নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা প্রয়োজন। সে যুগে রোকেয়া কি ধরণের সভা করিতেন আজ বিশ বৎসর পরে তাহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন।

ক্রমে রোকেয়ার চারিধারে একটী ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। ধীরে অতি ধীরে তাঁহারা বুঝিলেন—সভা-সমিতি কাহাকে বলে, তাঁহারা দেখিলেন নিজেদের দুর্গতি কতদূর চরমে পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা শিখিলেন তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে। এক কথায় বলিতে গেলে আঞ্জুমনে খাওয়াতীন

বিশ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে শত শত মুস্‌লিম নারীর চক্ষু ফুটাইল।

রোকেয়া আজ নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে-পতাকা তিনি এতকাল উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা ধূলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া যাঁহারা জাগিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহাদের কাজ হইল, তাঁহার হাতের জয়পতাকা সাবধানে বহন করিয়া লইয়া পথ চলা—যে কাজ তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই সম্পূর্ণ করিয়া তোলা।

মনে হয় দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের উপর আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লামের প্রভাব দিনে দিনে আরও বিস্তৃত হইতেছে। দেশের সমস্ত শক্তিশালী নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করায় গত কয়েক বৎসরে নারীসমাজের সমুদয় কল্যাণ-আয়োজনের মধ্যে ইহার কার্য্যকারিতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। নারীর সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও আইনগত অধিকার-অনধিকার লইয়া এই সমিতি যে আন্দোলন করিয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। এমন কি এসব ব্যাপারে দেশের গভর্ণমেণ্টও ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ইহার মতামতকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের আগামী শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারী

প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে। ১৯৩৫ সনের শেষভাগে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিবার জন্য বিহার-উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার লরী হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, নারীর অধিকার লইয়া এই সমিতি তাহার সঙ্গেও দরবার করিয়াছিল। কলিকাতা কাউন্সিল হাউসে সমিতির প্রতিনিধি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং বঙ্গনারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করেন।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সমিতি যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপত্তন করিয়াছে, ভবিষ্যতে হয়ত ইহাই দেশের নারীসমস্যার একটা দিক সমাধানের পথে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।

কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়া গেল, এদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে তাহার বিবরণ স্থায়ী অক্ষরে লেখা থাকিবে। আয়ার্ল্যাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, সুইজারর্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, গ্রীস, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলাকর্ম্মিগণ সমগ্র নারী জাতির কল্যাণ-কামনায় ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম, বাঙ্গলা বা নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি এই সম্মিলনে

যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া মুসলমান মেয়েদের কর্ম্মপ্রিয়তার পরিচয় দেন।

সমিতির কাজে রোকেয়ার অনুবর্ত্তিগণকে যে পদে পদে বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া পথ চলিতে হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু দেশের নারীচিত্তকে জাগ্রত করিবার জন্য যিনি এত দীর্ঘ দিন আপনাকে তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গেলেন, যুদ্ধজয়ের সমস্ত যশোভাগ তাঁহারই প্রাপ্য।

অবসান

গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বাংলার নারী ইতিহাসে এক শোচনীয় দিন। আমাদের বড় আদরের, বড় গর্ব্বের, বড় গৌরবের রোকেয়া সেদিন অকস্মাৎ পরলোক যাত্রা করিলেন। দুর্ব্বার সাহস, একাগ্র সাধনা ও কঠিন পণ লইয়া যিনি এত দীর্ঘ দিন একই লক্ষ্যে চলিয়াছিলেন, কোন্ এক অদৃশ্য চালকের বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সকল ছাড়িয়া এক নিমেষেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। সৈনিকের জীবনের সহিত রোকেয়ার জীবনের কি চমৎকার সাদৃশ্য !

রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া কলিকাতার আকাশে সবেমাত্র ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার জীবনের কালসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কলিকাতা মহানগরী প্রতিদিনের মত নূতন উদ্যমে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এমনি সময়ে মুস্লিম বঙ্গের একটী বিরাট কর্ম্মকেন্দ্রে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইল।

কলিকাতার অলিতে গলিতে দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইল না। শুধু কলিকাতাই নয়, দেখিতে দেখিতে হাওড়া প্রভৃতি আশে পাশের সমস্ত স্থানে রোকেয়ার মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে শেষবারের

মত দেখিয়া লইবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অসংখ্য নারী সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন।

চিরদিনই রোকেয়া স্কুলের কাজকর্ম্মে অধিক রাত্রি পর্যান্ত জাগিয়া থাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় বারটা পর্য্যন্ত কাগজ-পত্রের ফাইলের মধ্যে তাঁহাকে ডুবিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। সেই রাত্রিই তাঁহার জীবনের কালরাত্রি একথা তখন কে জানিত? প্রত্যূষে যখন তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন তখনও তাঁহার দেহে বা মনে গ্লানির চিহ্নমাত্র নাই। পূবের আকাশে হাস্যমুখী উষা। রোকেয়ারও ঠিক তেমনি শান্ত প্রসন্ন ভাব। মুখহাত ধুইবার জন্য তিনি গোসল-খানায় ঢুকিয়াছেন। মৃত্যুর দূত বুঝি আলো-আঁধারের মধ্যে সেখানেই ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কি করিয়া কি হইল কে বলিবে? মুখহাত ধোওয়া আর হইল না। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা লইয়া ছটফট্ করিতে করিতে রোকেয়া আবার শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ব্যথিতের আর্ত্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাঁহার জীবনের কুন্দকুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল। সৌন্দর্য্যে রমণীয়, মহত্ত্বে বরণীয় ও গৌরবে স্মরণীয় একটী জীবনের উপর করাল কাল চকিতে তাহার কাল যবনিকা টানিয়া দিল।

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল যে প্রদীপ দীপ্ততেজে জ্বলিয়াছিল, কালের এক ফুৎকারে তাহা নিভিয়া গেল।

ভিতরে ভিতরে রোকেয়ার স্বাস্থ্য বোধহয় কিছুদিন হইতে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি—সেই চির-পরিচিত প্রসন্ন-উজ্জ্বল হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করিযা লইয়াছেন। শুধু কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে জানিতে পারিতাম যে তিনি ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে ডাক্তারের ব্যবস্থামত তিনি ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার বলিতেন—হাওয়া পরিবর্ত্তন ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। রোগী উত্তর করিতেন 'বিশ্রাম করিব কি, আমার যে মরিবারও অবসর নাই।'

তাঁহার কথাগুলি কিন্তু আমার মায়ের মনে শঙ্কার উদ্রেক করিত। মা বলিতেন—এবারে বুঝিবা সত্য সত্যই তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় হইল! রোকেয়ার জীবনের পরিপূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা মায়ের বড়ই ইচ্ছা ছিল। যখনই সুযোগ হইত, মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী শুনিতে চাহিতেন, আর আমাকে বলিতেন—এই রহস্যময় জীবনের ইতিহাস পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিবার ভার তোমার উপর রহিল।

স্কুল বা আঞ্জুমন সংক্রান্ত নানা কাজে রোকেয়ার সেখানে

মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়িত। কখনো আঞ্জুমনের রিপোর্ট লেখা, কখনো স্কুলের কাগজ পত্রের ফাইল গোছাইয়া দেওয়া, আর কখনো বা শিক্ষয়িত্রী কম পড়িলে স্কুলের অধ্যাপনার কাজে সাহায্য করা—এমনি নানা ধরণের কাজ। কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে তিনি মাঝে মাঝে নিরালা এক একবার আমাকে নিয়া বসিতেন। সেই সুযোগে নানা কথা উঠিত। মৃত্যুর অল্প দিন আগে একবার হঠাৎ বলিলেন—'আমি তো চলিলাম!' বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম—'কোথায়'? তিনি উত্তর দিলেন—'আমি কি চিরটা কাল এই ভূতের বোঝা বহিয়া মরিব? এবার আমার ছুটি নিবার পালা। আমার জন্য এক 'হোজরা' তৈয়ার হইতেছে। বাকী কটা দিন আমি সেখানেই অজ্ঞাতবাস করিব।' কথাটা খুলিয়া বলিলেন না। পরে জানিয়াছিলাম যে ঘাটশীলায় তাঁহার নূতন বাড়ী হইতেছে! কিন্তু যে-সাধনায় তাঁহার জীবন-যৌবন, শক্তি-সামর্থ্য, অর্থ-সম্পদ সমস্তই ব্যয় হইয়াছে—পূর্ণ সাফল্য আসিবার আগেই তিনি তাহা ছাড়িয়া চলিলেন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিবার জন্য, কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'স্কুলের তবে কি উপায়?' হাসিয়া বলিলেন, 'স্কুলের জন্য তোমরাই তো রহিলে। আমাকে এবার ছুটি দাও।' বলিলাম, 'কিন্তু পারিবেন কি, স্কুলের সম্পর্ক ছাড়িয়া দূরে থাকিতে? বিশ্রাম যে আপনার পক্ষে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে!'

মুখে কথাটার কোন উত্তর দিলেন না। শুধু উঠিয়া ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, চিঠিখানা লিখিয়াছেন তাঁহার চিরকালের এক হিতৈষী বন্ধু, শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। চিঠিতে স্কুলের অবস্থা, সমাজের ব্যবহার, রোকেয়ার সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা রহিয়াছে। প্রতি ছত্রে ছত্রে সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং রোকেয়ার প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে তিনি লিখিয়াছেন—"আপনার এই যে জীবন-ব্যাপী ত্যাগ, দুর্ভাগ্য সমাজ তাহার কি প্রতিদান দিল? এক একবার ইচ্ছা হয় বলি, 'আপনি এই অকৃতজ্ঞ সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করুন। স্কুলের জন্য জীবনপাত করিয়াই বা আপনার কি লাভ? যাহা করিয়াছেন এইটুকুই মানুষের শক্তির অতীত। এবার নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তির দিকে ফিরিয়া দেখুন। স্কুলের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জীবনের সায়াহ্নে এবার বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করুন।'

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবি, একি সম্ভব? পারিবেন কি আপনি স্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিতে? মৎস্য যদি জলাশয় না হইলে একদণ্ড টিকিতে না পারে, আপনিই বা স্কুলের আবেষ্টনের মধ্যে না হইলে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন?

"তারপরে সমাজের নিন্দা, ভ্রূকুটী ও বিরুদ্ধতা। এই

লইয়াই ত আপনার জীবন! ইহাই আপনার পুরস্কার, ইহাতেই তো আপনার তৃপ্তি। এ সব না হইলেই বা আপনি বাঁচিবেন কি লইয়া?”

মনে হইল চিঠিখানির মধ্যে রোকেয়ার অন্তরের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। বুঝিলাম, প্রথমে যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা তাঁহার মনের কথা নয়। দেহে শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকিতে স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব! কিন্তু যে বিদায়ের আভাস তিনি সেদিন কথা প্রসঙ্গে দিয়াছিলেন, জীবনে না হইলেও মরণে যে তাহা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে একথা তখন কে ভাবিয়াছিল?

রোকেয়া মরিলেন—জাতিকে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিয়া তিনি নক্ষত্রের দেশে নিরুদ্দেশ হইলেন। যে স্কুল-গৃহের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে ছিল তাঁহার শিরা উপশিরার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে তাহা হইতে তিনি চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর! রোকেয়াকে হারাইয়া সেদিন কলিকাতা মহানগরীতে যেন শোকের তুফান বহিয়াছিল। বাংলার মুসলমান নারী-পুরুষ সকলেই সেদিন বজ্রাহত!

১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলায় কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির পাতায় পাতায় দেখা গেল শোকের এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বিখ্যাত পত্রিকাগুলির বিশেষ সংখ্যা বাহির

হইল। সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়া দেশের ছোট বড় নেতা, সাহিত্যিক সকলে এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। স্বয়ং বাংলার গভর্ণর বাহাদুর দেশের ও জাতির এই বিরাট ক্ষতিতে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন।

বাংলা-মায়ের দুলালী রোকেয়াকে স্মরণ করিয়া দেশবাসিগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কলিকাতা আলবার্ট হলে এক মহতী সভায় সমবেত হইলেন। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি ও আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বাঙ্গালা বা নিখিলবঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি। অতবড় হলে বুঝি সেদিন তিল ধারণের স্থান ছিল না। যাঁহারা জীবনে কোনদিন পর্দ্দার বাহিরে যান নাই, এমনও অনেক মুসলমান মহিলাকে সেদিন আলবার্ট হলের বক্তৃতামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা গেল। সভানেত্রীত্ব করিলেন কলিকাতা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস পি. কে. রায়। রোকেয়ার প্রতিভা, একনিষ্ঠ সমাজসেবা, মহান ত্যাগ, জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যচর্চ্চা ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইংরাজী, বাংলা ও উর্দ্দুতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিলেন। চিরদিন যে-সমাজ আঘাতের পর আঘাতই হানিয়াছে, সেই সমাজেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে গোপনে এত শ্রদ্ধা-প্রীতি, এত কৃতজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা কে জানিত?

সকলের শেষে বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইলেন রোকেয়ার প্রতি

গভীর শ্রদ্ধাশীল এক তরুণ যুবক ; তিনি বলিলেন, "আজিকার বেদনা-উৎসবে সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু কিসের জন্য? লাট-বেলাট নহে, রাজা-মহারাজা নহে—একটী অবলা নারীর মৃত্যু আজ এতগুলি লোককে একত্রে মিলিত করিয়াছে। জাতি যে আজ জাগ্রত, ইহাতে একথাই প্রমাণিত হয়!

"সভায় অনেকে অনেক কিছু বলিলেন। রোকেয়ার যে সকল গুণ ও কার্য্যাবলীর কথা তাঁহারা উল্লেখ করিলেন তাহার প্রত্যেকটীই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জাতি তাঁহাকে কি প্রতিদান দিয়াছে? তাঁহার জীবনব্যাপী ত্যাগের ফলে সমাজের নিকট হইতে তিনি কি পাইয়াছেন? পাইয়াছেন অশ্রাব্য নিন্দা ও অকথ্য লাঞ্ছনা। এতবড় সভায় আজ কে আছে, একথার প্রতিবাদ করিবে? এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটী মানুষ আজ আপনার বুকে হাত দিয়া বলুন—একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পলে পলে কাহারা তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কাহারা তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া চলিয়াছিল। তাঁহারা বলিতে পারেন কি, রোকেয়ার মৃত্যুতে আজ শোক প্রকাশ করিবার তাঁহাদের কি অধিকার?

"রোকেয়া নাই। তিনি আজ ধূলিমলিন পৃথিবীর নিন্দা-গ্লানি হইতে অনেক উর্দ্ধে। তিনি শহীদের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রণক্লান্ত আত্মা বুঝি সমাজের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সকলের অলক্ষ্যে এই সভাগৃহে আজ অসহ্য ব্যথায় ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে।"

বিস্তীর্ণ সভাগৃহের প্রতি প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইল—"অসহ্য বেদনায় ফরিয়াদ করিতেছে।" এই মর্ম্মভেদী অভিযোগের উত্তরে কিছু বলিবার জন্য কাহারও মুখে ভাষা জোগাইল না। বিপুল জনসভা শুধু নিরুত্তরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। যুগজননী রোকেয়ার চলার পথে কুশ-কণ্টক রচনা করিয়া জাতি যে পাপ করিয়াছিল চোখের জলে বুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

জীবনকালে শুধু ব্যথা আর আঘাতই ছিল যাঁহার পুরস্কার, সেদিনকার মৃত্যু-উৎসবে বিপুল গৌরবে অশ্রুর মালায় তাঁহার অভিষেক হইল। কিন্তু পরপার হইতে বুঝি তিনি সেদিন তীব্র দুঃখে উচ্চারণ করিলেন—'অবেলায় এ যে বড়ই অবেলায়।'

তরুণ বক্তা আবার বলিলেন—"আমরা যে মহাপাপ করিয়াছি অশ্রুজলে তাহা মুছিবে না। তাহার একটি মাত্র প্রায়শ্চিত্তই বুঝি সম্ভব। এই সভাস্থলে রোকেয়ার পুণ্যস্মৃতিকে সাক্ষী করিয়া আমরা প্রত্যেকটী মানুষ আজ পণ করিতে পারি যে আমাদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি মেয়েকে শিক্ষিত করিয়া

তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব। বাংলাদেশের একটী বালিকাও যেদিন আর অশিক্ষিত থাকিবে না, সেদিন—শুধু সেদিনই বুঝি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।”

সভানেত্রী তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পরলোকগতার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, “রোকেয়া নাই এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা মিলিত হইয়াছি, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। মাত্র সেদিন তাঁহাকে দেখিলাম, স্কুল সংক্রান্ত নানা বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হইল।

“প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়; সেদিনের কথা আজিও ভুলি নাই। খর্ব্বাকৃতি পরমা সুন্দরী নারী—দেখিয়াই মনে হইল এক বিশিষ্ট ছাপ সর্ব্বাঙ্গে লেখা রহিয়াছে: উৎসাহ, উদ্যম, ও শক্তিব যেন এক জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

“আমি তখন কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন সবেমাত্র সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের স্কুলের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালীর সহিত তিনি পরিচিত হইতে চাহিলেন। তিনি নিজে কোন স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। চোখে দেখিয়া স্কুল পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

সঞ্চয় করিবেন এবং সেই অনুসারে নিজের স্কুল গড়িয়া তুলিবেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার বিশাল অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। তিনি জানিতেন, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান কখনো প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে পারে না। মানুষের জীবনকে উচ্চতর স্তরে তুলিয়া দিতে পারে যে-ধর্ম্ম, তাহাই শাশ্বত সত্যধর্ম্ম।

"আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম; কারণ আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকটা মিল ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ জানিতেন না, আমিও কখনো জানি নাই।

"আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কারণ ভারতীয় নারীত্বের যে আদর্শ আমি চিরদিন মনে মনে পোষণ করিয়াছি—যাহা একান্তই ভারতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমি মনে করি--তাহারই বিকাশ দেখিয়াছিলাম তাঁহার জীবনে।"

শুধু আলবার্টহলের এই জনসভায় যোগদান করিয়া কলিকাতার মহিলাসমাজ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; শোকার্ত্ত মনের বেদনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে এক বিরাট মহিলা সভার আয়োজন করিলেন। সভানেত্রীত্ব করিলেন লেডী আবদুর রহিম। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শতশত নারীর চোখে সেদিন বেদনার

অশ্রু বহিল। বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া চোখের জলে অনেকেই মুখের ভাষা হারাইয়া ফেলিলেন। জীবনে যাঁহারা রোকেয়াকে চেনেন নাই, সেদিন তাঁহাদেরও বুঝি চোখ ফুটিয়াছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতি ধূলিকণায় যেন সেদিন লেখা ছিল এক অব্যক্ত হাহাকার।

রোকেয়ার সমাধি হইল কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে তাঁহার আত্মীয়বর্গের পুরাতন গোরস্থানে। আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শবদেহ সোদপুরে নেওয়া হইল।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় কলিকাতার নারী সমাজে অসন্তোষ ও অতৃপ্তির মৃদু গুঞ্জন শুনা গিয়াছিল। 'কোকিল যতক্ষণ কাকের বাসায় থাকে ততক্ষণ সে কাকের, কিন্তু যেই মাত্র সে গান করিয়া উড়িতে শিখে তখন সে সমগ্র প্রকৃতির, সে বসন্তের, সে বিশ্বের।' রোকেয়ার উপরে আত্মীয় স্বজনের দাবী ছাড়াইয়া সমগ্র মানব-সমাজের দাবী আসিয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ গোরস্থানের মাটিতে যেখানে শত শত মানুষের অস্থিমজ্জা মিশিয়া রহিয়াছে সেখানেই তাঁহার শেষ শয্যা রচিত হইলে বুঝি তাঁহারও আত্মা অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিত। যাহাদিগকে লইয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাদের চোখের অন্তরালে পল্লীজননীর নিভৃত-ক্রোড়ে তিনি চিরদিনের মত ঘুমাইয়া রহিলেন।

আজিও বৎসর বৎসর আঞ্জুমন খাওয়াতীনের উদ্যোগে ৯ই

ডিসেম্বর তারিখে রোকেয়ার স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়া থাকে। শোকের অশ্রু হয়ত আজ শুকাইয়াছে, কিন্তু শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিঃশেষ হয় নাই—হয়তো কখনো হইবেও না। রোকেয়ার ত্যাগ-পূত জীবনের পুণ্যস্মৃতি এদেশের মুসলমান নারী-সমাজে অনন্তকাল ধরিয়া শক্তি ও প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস হইয়া জাগিয়া থাকিবে।

বাংলার মুসলমান নারী-সমাজকে জাগ্রত করিয়া রোকেয়া আজ অমৃতলোকযাত্রী। রোকেয়া মরিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে বাঁচিয়া উঠিয়াছে শত শত রোকেয়া—রোকেয়ার স্মৃতিসভায় দাঁড়াইয়া সকলের আগে একথাই মনে পড়ে। রোকেয়া মৃত, একথা যে কত বড় মিথ্যা—শত শত নারী সেদিন আপনার বুকে বুকে তাহা অনুভব করেন!

সফল সপ্ন

রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া কলিকাতার আকাশে সবেমাত্র ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল, একথা আগেই বলিয়াছি। এই ঘটনার একটী সুন্দর অর্থ দেখিয়া পাওয়া যায়। এ যেন আমাদের সমাজের অবস্থারই প্রতীক। তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় গগনের প্রভাতীতারা। তাঁহার প্রয়াণ—সেও যেন হইল প্রভাতীতারারই বিদায়যাত্রা। তিনি আসিলেন কাল-রাত্রির অন্ধকারে, গাহিলেন প্রভাতের আগমনী। রাত্রি অবসান হইল, অন্ধকার কাটিয়া গেল। অরুণ আলোকে মুক্ত আকাশতলে সমবেত হইল আলোক-শিশুর দল। রোকেয়া রাত্রির আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়াছিলেন—অন্ধকারে জ্বলিয়া-ছিলেন প্রদীপের মতো। দিনের আলোয় তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। তাঁহার কাজ ফুরাইল, আনন্দে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রোকেয়া শুধু কর্ম্মী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। নারী-জাগরণের যে অভিনব স্বপ্ন জীবনের সোনালী ঊষায় তাঁহার চোখের সম্মুখে জাগিয়াছিল, তাহাকেই বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়।

সংসারে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের অন্ত নাই। দৃষ্টিমান মানুষের নয়ন-সমক্ষে ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বহু কর্ম্মযোগী, হৃদয়বান ব্যক্তি মানব-কল্যাণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনকালে স্বপ্ন হয়ত শুধু স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে—সম্ভবের দেশে পক্ষ বিস্তার করে নাই।

কিন্তু রোকেয়ার অদৃষ্ট অন্যরূপ। এযুগে আমরা দেখিতে পাই কামাল পাশা, মুসোলিনী প্রভৃতি মহামানুষ জীবনকালেই নিজের আরব্ধ কার্য্যের ফলভোগ করিতে পারিতেছেন। এদিক দিয়া ইঁহাদের ভাগ্যের সহিত রোকেয়ার ভাগ্যের তুলনা হয়। ইঁহাদেরই মত রোকেয়ারও জীবদ্দশাতে তাঁহার সাধের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছিল।

'সুলতানার স্বপ্ন' নামক ইংরাজী গ্রন্থে রোকেয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তাহার পরিণতি কল্পনা করিতে গিয়া আকাশপথে ভ্রমণের যে মনোরম স্বপ্ন মানস-নয়নে দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ আমাদের বাস্তব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"যে সময় আমি 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখিয়াছিলাম তখন এরোপ্লেন ও জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না! এমন কি সেসময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখা কল্পনার অতীত ছিল।

অন্ততঃ আমি তখন সেসব কিছুই দেখি নাই। প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ সনে) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনো উড়ো জাহাজে উঠিতে পারিব এরূপ আশা কোনদিন করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।”

কিন্তু সুলতানার সেই বিচিত্র স্বপ্ন কিরূপে রোকেয়ার নিজের জীবনে সাফল্যলাভ করিল, তাহারও বর্ণনা আমরা তাঁহারই লেখনী-মুখে পাই।

“২রা ডিসেম্বর (১৯৩০ খৃঃ) মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। দমদমের এরোড্রোমে পৌঁছিয়া দেখি একেবারে মুক্ত ময়দান। কেবল আমাদের মোটর তিনটী এবং আমরাই। আমি আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুস্‌লিম পাইলট শ্রীমান মোরাদের প্লেনে গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি ধরাখানা সত্যই সরাতুল্য। আমি ক্রমে তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার! আমার দক্ষিণ দিকে অস্তগামী সূর্য্য, বামে দ্বাদশীর পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র—উভয়ে যেন আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নীচে চাহিয়া দেখি, কলিকাতার পাকা বাড়ীগুলি—কোঠা, বালাখানা, ইমারত,—সব ইষ্টক-স্তূপের মত দেখাইতেছে। হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা বিশেষ! আর হুগলী নদী—সেত

জলাশয়ের সামান্য একটী রেখার মত দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়া নীচে নামিলাম।”

“পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ‘সুলতানার স্বপ্নে’ বর্ণিত বায়ু-যানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুস্‌লিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধ-বন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই।”

সুদূর অতীতে কল্পনার চোখে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের আনন্দে সেদিন তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। আধুনিক বিজ্ঞানের যাদুকরী শক্তির বিকাশই তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন নয়। নারী-জাগরণের সম্মোহন স্বপ্নে তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত বিভোর হইয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা বিফল হয় নাই। জীবনের সায়াহ্নে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাঁহার স্বপ্ন বাস্তব জীবনে অভিনব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে।

তাঁহার শেষ জীবনের কথা আলোচনা করিলে একটী সুন্দর ছবি মনে জাগে: একটী মৃত নারী-সমাজ ধীরে—অতি ধীরে নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছে, আর একটী কল্যাণী বিধবা সমস্ত প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া সেই জাগরণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতেছে।

রোকেয়ার মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে একটী নারী-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলাম। এই সম্মিলনে সভানেত্রীত্ব করিয়া তিনি আমাদিগকে গৌরবান্বিত করেন। সাফল্যের গৌরব ও তৃপ্তি তাঁহার সেদিনকার অভিভাষণের প্রতি ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বলেন—"আজ আমি আপনাদের দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে আমি মুস্‌লিম নারী-সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু ঘুম তাঁহাদের কিছুতেই ভাঙিতেছিল না। ডাকিয়া ডাকিয়া জাগাই—আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমান। বাইশ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহারা আগে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেন, পরে উঠিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন—কিন্তু গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন না। সুখের বিষয় এদিকে কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, তাঁহারা চোখ রগড়াইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ এতগুলি শিক্ষিতা মহিলাকে দেখিতে পাইয়া চক্ষু জুড়াইল।"

এই সম্মিলনের কয়েক বৎসর আগে একটী মহিলা সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনারা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে আমি আজ বাইশ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারত-নারী। ঐ

জীবগুলির জন্য কখনো কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে। তাই যত্রতত্র পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটী লোকও এ ভূভারতে নাই।”

কিন্তু আজিকার সম্মিলনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উন্নতি ও স্থায়িত্বের বিষয়ে মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া তিনি সকৌতুকে বলিলেন—“আমাদের মত অবরোধ-বন্দিনীদের পুড়িয়া দিলে ভূতেও খায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহস করিয়া অবরোধের নাগপাশ ছিঁড়িতে পারিয়াছেন তাঁহারাই একাজে অগ্রসর হউন।” বলিতে বলিতে আশা ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে তাঁহার দুচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ আর তাঁহাকে নারীজাতির জন্য কাঁদিবার লোক খুঁজিতে হইল না। জাগ্রত নারী-শক্তিতে তাঁহার চেয়ে আর কে বেশী আস্থাবান ছিল? দায়িত্ব বাস্তবিক পক্ষে যাঁহাদের— তাঁহাদেরই হাতে তাহা তুলিয়া দিতে পারিয়া বুঝি তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রোকেয়ার সঙ্গে দেখা হইলে প্রায়ই অনুযোগ করিতেন —‘তোমাকে আর কত বলিব? বি. এ. পরীক্ষাটা শেষ না করিয়া কেন যে ফেলিয়া রাখিয়াছ জানি না।’ আনন্দের বিষয় এই যে, মৃত্যুর বৎসরেই তাঁহার এই সাধ পূর্ণ হইয়া-

ছিল। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল সেদিন তাঁহার চেয়ে সুখী বোধহয় আর কেহ হয় নাই।

একদিন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলাম যে, আমার পরীক্ষায় সাফল্য উপলক্ষে তিনি এক মহিলা সভার আয়োজন করিতেছেন। বুঝিলাম, ইহাতে আমার কৃতিত্বের পরিচয় যতটা নাই—তার চেয়ে বেশী আছে তাঁহারই আনন্দের প্রকাশ।

রোকেয়ার আহ্বানে সেদিন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সেদিন সভাসমক্ষে তাঁহার মুখে চোখে যে আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জীবনে ভুলিব না।

অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিতে গিয়া তিনি বলিলেন—"আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে—আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরব্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না। যে বাদশাহ্‌ কুতুবমিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।"

বাস্তবিকই তাঁহার জীবনে বুঝি আর অপূর্ণতার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনিতাম—"বেশী নয়, আর

দশটী বছর যদি বাঁচিতে পারি তবে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তি এমন মজবুত করিয়া দিয়া যাইতে পারিব যে তাহার স্থায়িত্বের জন্য আর ভাবিবার কারণ থাকিবে না।”

স্কুলের একটী নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি বিল্ডিং ফাণ্ডে সঞ্চয়ও কম করেন নাই। আর কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিলে স্কুলকে নিজস্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি এই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে প্রার্থিত অবকাশ দেয় নাই।

তিনি আজ মরণের পরপারে, কিন্তু তাঁহার বড় সাধের সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল আজ একটী প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিচালন-ভার আজ গভর্ণমেণ্ট নিজ হাতে লইয়াছেন।

শুধুই তাহাই নয়। দেশব্যাপী জড়তা ও অবসাদের মধ্যে রোকেয়া যে কর্ম্মের স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন তাহারও গতি দিন দিন প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া চলিয়াছে। মুস্‌লিম বঙ্গের মুক্তিপথ-যাত্রিণীদের ঘিরিয়া বুঝি তাঁহার কল্যাণ-আঁখি আজিও অনিমেষে জাগিয়া আছে। মনে হয়, পরপার হইতে আজিও তিনি তাহাদের শিরে অহরহ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন!

চরিত্র পাঠ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাহজাহানের উদ্দেশে বলিয়াছেন, 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে, তোমার তাজমহলের চেয়ে—হে সম্রাট, তুমি ছিলে মহত্তর।' রোকেয়ার জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই বলিতে ইচ্ছা হয়। মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য রোকেয়া একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—বহুদিন পরেও হয়ত একথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মানুষের শির অবনত হইবে। কিন্তু শুধু একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী বলিলে তাঁহার সত্যকার পরিচয় হইল না—বাংলার মুসলমান নারীসমাজের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এই অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে একটা সমাজের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; আর এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের জন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী এই কল্যাণী নারী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকারের কুঁড়িতে রোকেয়া ফুটিলেন আলোকের শতদল পদ্মের মত, এ যেন প্রকৃতির রহস্য বিলাস! দীর্ঘকাল শবসাধনা করিয়া তিনি কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন,

তাঁহার স্বপ্ন কিরূপে সফল হইল—তাহাও এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে মনে হয় সাফল্যের বীজ তাঁহার নিজের চরিত্রের মধ্যেই লুকানো ছিল।

মনে হয়, রোকেয়ার সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁহার কঠিন পণ ও আদর্শের প্রতি তাঁহার বিশ্বস্ততা। 'সত্য প্রিয় হোক, আর অপ্রিয় হোক, সাধারণের গৃহীত হোক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হোক, সত্যকে বুঝিব, খুঁজিব ও গ্রহণ করিব' এই ছিল তাঁহার পণ। শুধু ইহাই নয়। তাঁহার আদর্শ ছিল ইহার চেয়েও উচ্চ। সত্যকে শুধু গ্রহণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। সত্যকে প্রচার করিবেন—দেশের প্রত্যেকটী হৃতভাগ্য নারীকে জ্ঞানের পথে টানিয়া লইবেন, এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার লৌহের মত দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সমাজসেবা করেন অনেকেই। কিন্তু রোকেয়ার মত এমন আপন-ভোলা সমাজ-সেবা কে কবে দেখিয়াছে! সমাজের জন্য এমন করিয়া নিজের ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজন, বিত্তসম্পত্তি, মানসম্ভ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্ত হইতে সংসারে ক'জন লোক পারিয়াছেন জানিনা।

রাজনীতিক্ষেত্রে কত প্রসিদ্ধ দেশনেতাকে অনেক সময় মত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ ও নূতন আদর্শ গ্রহণ

করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রোকেয়ার ছিল একই রাজনীতি—তাহা নারীজাগরণ। অর্দ্ধশতাব্দী আগে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকেই মুক্তির একমাত্র অভ্রান্ত সত্যপথ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এতখানি দৃঢ়তা ও এতখানি একাগ্রচিত্ততা যাঁহার মধ্যে ছিল, এত দীর্ঘ দিন পরেও সাফল্যের সুবর্ণ-কুঞ্জিকা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িবে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

রোকেয়া-জীবন আলোচনা করিলে আমাদের চোখে উজ্জ্বল হইয়া জাগে তাঁহার স্বভাবের একটী গুণ—কোমল ও কঠোরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাঁহার মন ছিল মমতা-মধুতে ভরা। নারীর দুঃখে সে মন মোমের মত গলিয়া যাইত। কি করিয়া এ দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তিনি বেদনায় আকুল হইতেন। কিন্তু এই কোমল নারী-চিত্তেরই অন্তরালে এত দৃঢ়তার স্থান কোথায় ছিল তাহা কে বলিবে? কুসুম-কোমলা নারী কোথা হইতে পাইলেন অত অবিচলিত অধ্যবসায়, অত দুর্ব্বার শক্তি ও সাহস, কে একথার উত্তর দিবে?

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রোকেয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এই সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে; কিন্তু এই বিদ্রোহ তাঁহার স্নেহ-সুকুমার হৃদয়ের গভীর মমত্ববোধকে ক্ষুণ্ণ করিতে

পারে নাই। ধ্বংসের আনন্দের চেয়ে সৃষ্টির বেদনাই তাঁহার জীবনে বেশী কার্য্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা ছিল সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভা। তাঁহার কথা, তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার সাহিত্য—সকল কিছুর মধ্য দিয়াই তিনি সমাজের কুসংস্কারের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের উদ্দামতার চেয়ে চিরকালই বেশী ফুটিয়াছে তাঁহার দরদী মনের তীব্র বেদনা-বোধ। তাঁহার প্রতিভার বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এখানেই।

জীবনের প্রভাতে চক্ষু মেলিয়া তিনি সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা নির্ণয় করিয়াছিলেন তিনি নিপুণ চিকিৎসকের মতই। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা—একথা তিনি ধ্রুব জানিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, শিক্ষার আলো যেদিন জ্বলিবে সেদিন কুসংস্কার কুয়াসার মত আপনিই মিলাইয়া যাইবে—তাহার জন্য আর হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

মুসলিম নারী সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায় অবরোধ-প্রথা একথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত অবরোধপ্রথার তুলনা হয়। বিনাযন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া

লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবকাশ পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী শত শত নারীও এই অবরোধ-গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া মরিতেছে।'

পর্দ্দা অর্থে তিনি বুঝিতেন সবল ব্যক্তিত্ব, কোন প্রকার বাহ্য আড়ম্বর নয়—তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই একথা বলিবেন। 'পর্দ্দা ও অবরোধ ভিন্ন জিনিষ—পর্দ্দা ঐসলামিক কিন্তু অবরোধ অনৈসলামিক' এই বুলি আজ-কাল অনেককেই আওড়াইতে শুনি। কিন্তু একদিকে নারীর আচরণের সুন্দর সংযম ও শালীনতা অর্থাৎ পর্দ্দা এবং অন্য দিকে অর্থহীন, প্রাণঘাতী অবরোধ—এই দুইয়ের মধ্যে এক যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য সেই সুদূর অতীতে রোকেয়াই সকলের আগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই লেখনী মুখে একথা সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, তাঁহার 'মতিচুর' ইহার সাক্ষ্য দিবে।

কিন্তু এসকল সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে রোকেয়ার আসল বিদ্রোহ অবরোধের বিরুদ্ধে নয়। তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন না। তিনি জানিতেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধের মুখোস আপনি খসিয়া পড়িবে! তাই শিক্ষা প্রচারের জন্যই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। জগতের কয়জন সংস্কারক এত সংযম, এত সতর্কতা, এত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিতে পারি না।

রোকেয়া অক্ষরের দাসত্ব না করিয়া ইস্‌লামের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী যেদিন প্রচারিত হয় সেদিন অন্ধ সমাজ বারে বারে শিহরিয়া উঠিয়াছিল—'পাপের পথে লইয়া যাইতে চায়, কে এই ধর্ম্মদ্রোহিণী ?' কিন্তু রোকেয়া বিচলিত হন নাই। মিথ্যা আচার ও অনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি ইস্‌লামের সত্যরূপ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন—একথা তিনি নিশ্চিত জানিলেন। ধর্ম্মের বাহ্য খোলসকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন নাই—এখানেই তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব।

টিয়া পাখীর মত কোরাণ মুখস্থ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"শৈশব হইতে আমাদিগকে কোরাণ মুখস্থ করানো হয়, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন তাহার একবর্ণেরও অর্থ বলিতে পারে না। যাঁহারা অর্থ শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইস্‌লামের মর্ম্ম তাঁহাদের কাছে এক বর্ণও ধরা পড়ে নাই, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে ?" এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিতেন। তিনি বলিতেন "নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করিয়া মরিল।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলিতেন—আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয়—আমাদের জন্মগত অধিকার। ইস্‌লাম নারীকে সাতশ বছর আগে যে অধিকার দিয়াছে তার চেয়ে আমাদের দাবী একবিন্দুও বেশী নয়।

তিনি বলিতেন—'ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্‌লামিয়া কলেজে ভর করিয়া পুলসেরাত (পারলৌকিক সেতু) পার হইবেন, আর সে সময় স্ত্রীকন্যাকেও হ্যাণ্ডব্যাগে পুরিয়া পার করিয়া নিবেন।' এই তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তির অন্তরালে ফুটিয়াছে তাঁহার ক্ষমাহীন অভিযোগের তীব্র জ্বালা।

তিনি আরও বলিতেন—'বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলেই শুনি মুসলমান বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই। কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? যাঁহারা কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের জন্য হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কি দরিদ্র ? তাঁহারা যদি শরিয়ৎ মানিতেন তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয়ে দান করিতেন।' সমাজ তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহিণী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই! কিন্তু তিনি সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়া ধর্ম্মের সত্যকার শিক্ষার দিকে বারে বারে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের নির্দ্দেশকে কোরাণের পাতায় আবদ্ধ

না রাখিয়া বাস্তব জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন।

রোকেয়া ছিলেন অতি পুরাতন এক সম্ভ্রান্ত শরীফ বংশের সন্তান। মান মর্য্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে বর্ত্তমান বাংলায় যে সকল পরিবার অগ্রগণ্য তাহার অনেকগুলির সঙ্গেই ছিল রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কখনো গৌরব অনুভব করিতে দেখি নাই। বরং সম্ভ্রান্ত অর্থে তিনি বুঝিতেন অভিশপ্ত। আমার বি. এ. পাশ উপলক্ষে বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন—'সম্প্রতি আরও কয়েকটী মুসলমান মেয়ে বি. এ. পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নাহারের পাশে একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ সে এক অভিশপ্ত অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, যাদের জন্য লেখা পড়া একেবারে হারাম।' বংশমর্য্যাদাকেই আশ্রয় করিয়া অশিক্ষা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইবার বেশী সুযোগ পাইয়াছিল, তাই সম্ভ্রান্ত বংশের নামেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন।

ঘরের চেয়ে বাহিরকেই তিনি বেশী আপনার বলিয়া জানিয়াছিলেন! তিনি জানিতেন, ঘরের সম্পর্ক দেহের, রক্তের; কিন্তু বাহিরের সম্পর্ক হৃদয়ের—অন্তরের অন্তরতম জনার।

তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়া। মনে পড়ে, তাঁহার সহজ, সরস, সাবলীল অথচ

তীক্ষ্ণ, জোরালো লেখা বাল্যকালেই মনকে যেন কেমন অভিভূত করিত। তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিত যে নূতন জীবনের বাণী, তাহা যেন অলক্ষ্যে প্রাণের দুয়ারে আঘাত করিয়া যাইত।

দশ বৎসর বয়সেই যখন স্কুল ছাড়িয়া পর্দ্দানশীন হই, তখন হইতে উচ্চশিক্ষার জন্য মনে একটা আগ্রহ জাগিয়াই ছিল; আর তাহাই রোকেয়ার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। সমাজের এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় অভিযোগ করিতাম। পরে জানিয়াছিলাম আমার বাল্যের সেই ক্ষীণ প্রচেষ্টা রোকেয়ার চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই।

পনের ষোল বৎসর আগে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন —"তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া বহুকাল আগের একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রিবেলা আমরা বিহারের এক জলপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলাম। বাহিরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শুধু নদীতীরের অন্ধকার বনভূমি হইতে কেয়াফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কখনো দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি।" এভাবেই বিনা পরিচয়েই তিনি আমাকে স্নেহের সূত্রে বাঁধিয়া লইলেন। বাংলাদেশের কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী বালিকা শিক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র

আগ্রহ দেখাইয়াছে, সেই ছিল তাঁহার সকলের চেয়ে আপনার, তাহারই সঙ্গে ছিল তাঁহার প্রাণের যোগ সব চেয়ে বেশী।

আমার শৈশব ও কৈশোরের কল্পনার সেই রহস্যময়ী নারীকে প্রথম স্বশরীরে দেখিলাম ১৯২৫ সনে এই কলিকাতার বুকে। মনে হইল, আমি ধন্য হইলাম, আমার নূতন জন্ম লাভ হইল।

তাহার পর হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রতিদিন যেন তাঁহার চরিত্রের নূতন নূতন পরিচয় চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে।

সহজ অনাড়ম্বর ভদ্রতা ও মধুর ব্যবহারে তিনি অতি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সরল সুন্দর একটী হাসির রেখা তাঁহার মুখে সকল সময়েই লাগিয়া থাকিত। শত ঘাত প্রতিঘাতেও তাহা কখনো ম্লান হইতে দেখি নাই। আঞ্জুমনের সভায় কতবার দেখিয়াছি, ছুতানাতা ধরিয়া মহিলাগণ তাঁহাকে অপ্রিয় ভাষায় অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন; এমনকি কোন কোন অশিক্ষিত মহিলা সমিতি ও স্কুল সম্পর্কিত টাকাকড়ির হিসাব লইয়া তাঁহাকে মুখের উপর অপমান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে কখনো বিচলিত হইতে দেখি নাই।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে একবার দেখা করিতে গিয়া যেন তাঁহাকে একটু মলিন দেখিলাম। মনে হইল তাঁহার সদা-

প্রফুল্ল মুখে একটু বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। বুঝিলাম, আজিকার আঘাত গুরুতর। জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, 'জীবনে অনেক দংশনই সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আজিকার দংশনের বিষ বুঝি সকলের চেয়ে তীব্র।' ঘটনা খুলিয়া বলিতে বলিতে ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল, কিন্তু ঠোঁটের কোণের হাসিটি তখনো মিলাইয়া যায় নাই।

কাজের কথাবার্ত্তার মধ্যেও তিনি উপমা দিয়া, ছড়া কাটিয়া বাক্যালাপকে সরস ও চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিতেন। এই রহস্যপ্রিয়তা তাঁহার স্বভাবের একটী চমৎকার বৈশিষ্ট্য। কি কথায়, কি বক্তৃতায়, কি সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রোকেয়ার নিজের কোন সন্তান বাঁচিয়া ছিল না। কিন্তু বাহিরকে তিনি ঘরে বাঁধিয়াছিলেন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনে অসংখ্য পরের সন্তানকে তিনি আপনার বক্ষঃরক্তে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। স্কুলের অসংখ্য বালিকা তাঁহারই মধ্যে মাতৃরূপের সন্ধান পাইত। প্রত্যেকটী বালিকাকে তিনি চিরদিন কিরূপ গভীর স্নেহে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং বালিকাগুলিও তাঁহাকে কি অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছে, নীচের কয়েকটী কথায় তাহার পরিচয় দিয়া এই মহিমময়ী নারীর বিচিত্র চরিত্রের আলোচনা

শেষ করি। কথাগুলি বলিয়াছে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের এক পূরাতন ছাত্রী, রোকেয়ার বহু যত্ন ও সাধনায় গঠিত এক আদর্শ বালিকা, রওশন আরা।

"সেই পুণ্যশীলা মহীয়সী মহিলার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে যেন একটী নিবিড় আন্তরিকতা মিশানো থাকিত। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাতে যেন তাহাদেরও প্রাণে সাড়া না জাগাইয়া পারিত না।

"মনে পড়ে তাঁর আদেশমত দৈনিক ক্লাস আরম্ভের পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটা 'দোওয়া' পড়িতেন, আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম। ঐ 'দোওয়া'টি যখন তিনি পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতা-ভরা আবেদন, তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়—মুখে বলা যায় না।

"তিনি আমাদের মাঝে মাঝে নানারকম পরীক্ষার জন্য অন্যান্য স্কুলে নিয়া যাইতেন—যেমন বঙ্গীয় পরিষদের পরীক্ষা, বৃত্তি পরীক্ষা ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্ব্বে আমরা পরীক্ষার্থিনীরা যথাসময়ে মিলিত হইয়াই দেখিতে পাইতাম যেন এক পবিত্রা শুদ্ধা তপস্বিনী আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি আসিয়াই ইঙ্গিতে আমাদের আহ্বান করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেন এবং মধুর সুরে দোওয়া পড়া আরম্ভ করিতেন;

আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যাইতাম, তারপর তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া 'বাসে' উঠিতাম। 'বাস' স্কুল কম্পাউণ্ড না ছাড়া পর্য্যন্ত তেমনিভাবে আমাদের দোওয়া পড়া চলিতে থাকিত। ক্রমে 'বাস' চলার দ্রুততার মধ্যে তিনি থামিয়া যাইতেন, আমরাও যেন তখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতাম। ভয়ভীতি হইতে মন যেন তখন আমাদের অনেকটা মুক্ত হইয়া গিয়াছে, প্রাণে আসিয়াছে যেন একটা স্বর্গীয় প্রেরণা।

"তখন অতশত বুঝিতাম না; কিন্তু আজ ভাবি, সেই পতিপুত্রহীনা মহিলার আমরা কে ছিলাম, যে আমাদের কল্যাণ কামনায় তাঁর আকুল প্রার্থনা খোদার 'আরশ' কাঁপাইয়াছে। আমাদের অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রীদের মঙ্গলই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল চান, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই মহীয়সী নারী সারাজীবন প্রাণ ভরিয়া রাশি রাশি নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় বালিকার মঙ্গল কামনা করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া—একথার উত্তর কে দিবে? প্রতিধ্বনি বলিতেছে, কে উত্তর দিবে?"

সাহিত্যিক রোকেয়া

এ পর্য্যন্ত আমরা প্রধানতঃ রোকেয়ার কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য-পূর্ণ ইতিহাসই আলোচনা করিয়াছি। এবার আলোচনা করিব তাঁহার সাহিত্য-জীবন। রোকেয়া-জীবনীর একটা বিশিষ্ট দিক অধিকার করিয়া আছে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা। মনে হয়, কর্ম্মী রোকেয়ার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন সাহিত্যিক রোকেয়া।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যৎ-নারীজাতির শক্তি ও স্বাধীনতার যে গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ বাহ্যপ্রকাশ দেখা যায় তাঁহার কর্ম্মজীবনে। তাঁহাকে যাঁহারা বাহির হইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন—মুসলমান মেয়েরা সুশিক্ষা লাভ করিবেন, এই অভিলাষই ছিল তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার গোড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ছিল ইহার চেয়ে কত বেশী উচ্চ, তাঁহার নারীত্বের আদর্শ ছিল ইহা অপেক্ষা কত বেশী মহান, নারীর শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল কত পর্ব্বতপ্রমাণ—তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, শুধু তিনিই একথা জানেন।

রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুল, সমিতি, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য তাঁহার আজীবনের সাধনা, তাঁহার বন্ধু-বান্ধব শিষ্যবর্গ,— এসব দেখিয়া আমরা বাহিরের রোকেয়াকে এক নিমেষে ধরিতে পারি। কিন্তু ভিতরের রোকেয়াকে—তাঁহার সুকুমার অনুভূতির সঙ্গে যে রোকেয়া মিশিয়া আছে, তাঁহাকে চিনিবার একমাত্র উপায় তাঁহার সাহিত্য। বাহিরে এই অসামান্যা নারীর যে বিরাট চরিত্র, যে বিপুল কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই— তাহার উৎসমুখের সন্ধান পাইতে হইলে ফিরিয়া দেখিতে হইবে তাঁহার সাহিত্যের দিকে। শুধু আজ বলিয়া নয়, দীর্ঘকাল পরেও মানুষ সাহিত্যের ভিতরেই তাঁহার সত্যিকার পরিচয় খুঁজিয়া পাইবে।

সুদূর অতীতে যে সকল মুষ্টিমেয় মুসলমান বাংলা সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, রোকেয়া তাঁহাদের একজন। কিন্তু আমরা সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি, রোকেয়ার চলার পথ আগাগোড়া একেবারে নূতন ও নিজস্ব; এ-ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার রচিত সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখের সম্মুখে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক সমাজে সে ছিল প্রধানতঃ অনুকরণের যুগ। আজিকার বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছে যে পরিশ্রমী, চিন্তাশীল, শক্তিমান, নবীন সাহিত্যিক সঙ্ঘ—সে

যুগে তাহা ছিল কল্পনাতীত। অনেকটা অন্ধভাবে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়াই সেকালের মুসলমান সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের নিত্যকার হাসিকান্না, অথবা নিজেদের সমাজের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা তাঁহাদিগকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ততটা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। মোটের উপর তাঁহাদের সৃষ্টির মূলে সাহিত্যিক প্রেরণার চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছে অনুকরণের চেষ্টা ও আগ্রহ। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন প্রতিভার আবির্ভাব হইল—কাহারও অন্ধ অনুকরণে নহে, আপনার ব্যক্তিত্ব ও বেদনার রসেই সাহিত্য সৃষ্টি করা হইল যাঁহার ধর্ম্ম। এই সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্য-প্রতিভা আর কেহই নহেন—রোকেয়া।

অবরুদ্ধ মুসলিম অন্তঃপুরে রোকেয়ার আবির্ভাব যেন আগাগোড়া একটী পরম বিস্ময়ের ব্যাপার; তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা—বিশেষ করিয়া তাঁহার বাংলা সাহিত্য সাধনার দিক আলোচনা করিলেও এই ধারণাই আরও বদ্ধমূল হয়। আমরা দেখিয়াছি বাংলা ভাষা শিক্ষা তাঁহাদের পরিবারে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তাহারই মধ্যে শুধু যে তিনি বাংলা শিখিলেন তাহা নহে, বাংলা ভাষাকে মনে প্রাণে ভালবাসিলেন এবং সমাজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করিয়া বাংলা

সাহিত্যসেবাকে জীবনের অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

আজকাল সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাইলে প্রায়ই মুসলমান লেখিকার নাম চোখে পড়ে। কিন্তু সে-যুগে প্রকাশ্যে কাগজপত্রে লেখনী চালনা করা মুসলমান মহিলার পক্ষে যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ ছিল তাহা আজ কল্পনা করাও কঠিন। নিজের সাহিত্য-সাধনার কথা আলোচনা করিতে গিয়া রোকেয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেসা খানমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "আমাকে সাহিত্য চর্চ্চায় তিনিই (করিমুন্নেসা) উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।" করিমুন্নেসা নিজেও সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। রোকেয়া লিখিয়াছেন: "করিমুন্নেসার রচিত কবিতাগুলি দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজকাল দেখি কোন কোন লোক ভালরূপে বর্ণজ্ঞানের সহিত পরিচিত না হইয়াও ভাড়া করা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজ নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালেভদ্রে কোন রচনা বা পুস্তক বেনামীতে ছাপা হইত। অধিকাংশ রচনাই—বিশেষতঃ কবিতার বাঁধানো খাতাগুলি তাঁহার বাক্সের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি জোর করিয়া তাঁহার

কয়েকটী কবিতা কোন সংবাদপত্রে দিয়াছিলাম। তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে ‘সাবের বংশের জনৈক কন্যা’ নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখিয়াছিলেন “সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার। আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরো পাঠাইবেন।”

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে করিমুন্নেসার মৃত্যু হইলে রোকেয়া বলিয়াছিলেন “তাঁহার দেহত্যাগকে অকাল মৃত্যু বলা যায় না বটে, তবু কিন্তু আমার মনে হয় তিনি আরো দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ দিলে ভাল হইত। এখন আর আমার কিছুই ভাল লাগে না; মনে হয়, লিখিলে আর কে পড়িবে।” রোকেয়ার স্বামী ছিলেন বিহারের অধিবাসী। যৌবনের প্রারম্ভে যখন মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন হইতেই বিহারের গোঁড়া উর্দ্দু ভাষী মুসলমান সমাজে তাঁহাকে বিচরণ করিতে হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর পরও কলিকাতার উর্দ্দু সমাজেই তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। তাহা সত্ত্বেও চিরকাল তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালী; বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার সত্যকারের প্রকাশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মনে হয় করিমুন্নেসার প্রভাব ইহার গোড়ায় অনেকখানি কাজ করিয়াছিল।

এক মহান্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া রোকেয়া কলম ধরিয়াছিলেন। চাঁদের জ্যোৎস্না, তারার দীপালী ও ফুলের সুবাসই তাঁহার সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপুল মমতাময় অন্তরে নিপীড়িত নারীত্বের যে করুণ ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাকেই সম্মুখে রাখিয়া তিনি সাহিত্যসেবায় অগ্রসর হইলেন। যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধাতা তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারই সাফল্যের চেষ্টায় তাঁহার বিপুল সাহিত্য-প্রতিভা নিয়োজিত হইল। বাস্তবিকই তাঁহার শক্তিশালী লেখনী যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এবং মুসলমান নারীসমাজের জাগরণ ও অগ্রগতি সহজতর ও দ্রুততর করিয়া দিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রোকেয়া জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই ঘাতপ্রতিঘাতময় কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবার বহু আগেই তাঁহার সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে যে সকল নূতন ভাব, নূতন বেদনা ও নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে সঞ্চিত হইতেছিল, বিবাহিত জীবনের সুখময় অখণ্ড অবসরে সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাহারা প্রকাশের সুযোগ পায়।

মতিচূর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থে তাঁহার জীবনের

ঐকান্তিক স্বপ্ন অভিনব রূপ লাভ করিয়া আছে। মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ডের ডেলিসিয়া-হত্যা প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখিকা মেরী করেলির Murder of Delicia নামক উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। সুসভ্য স্বাধীন দেশেও নারী কত অসহায় এই গল্পে তাহারই নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—"আজ আমরা ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সামাজিক দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব—অবলা-পীড়নে কোন্ সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত, ইংরেজ রমণীর জীবন কিরূপ। আমরা মনে করি তাঁহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষ, সমাজে আদৃত, —তাঁহাদের আরও কত কি সুখ-সৌভাগ্যের চাকচিকাময় মূর্ত্তি মানসনয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারিলে বুঝা যায় সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর।"

অন্যত্র বলিয়াছেন, "তালাক লইতে হইলে ডেলিসিয়াকে প্রমাণ করিতে হইবে স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন। ডেলিসিয়া ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। হায়রে আইন! পুরুষরচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি। অবলা-হৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটী করা—তাহাকে জীবন্ত হত্যা করা আইন অনুসারে অত্যাচার নয়। কাহাকেও শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন জখম করিলে অপরাধীর শাস্তি

আছে। কিন্তু রমণীহৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে, রমণীপ্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে কোন দণ্ড নাই।”

‘মুক্তিফল’ প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন নারীর সহায়তা না হইলে একা পুরুষের প্রচেষ্টায় দেশজননীর স্বাধীনতা অসম্ভব।

‘অবরোধবাসিনী’তে বাংলা ও বিহার অঞ্চলের সত্যিকার অবরোধবাসিনীদের জীবনের অশ্রুকরুণ চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভূমিকায় মৌলবী আবতুল করীম সাহেব বলিতেছেন—‘অবরোধবাসিনী লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেকপ্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের অবরোধবাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আর কেহ লিখেন নাই।’ ‘অবরোধবাসিনী’ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে রোকেয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—“শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, অবরোধবাসিনীর ঘটনাগুলি অনেক জায়গায় এতই আজগুবি যে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমি নিজে জানি যে ইহার একটী অক্ষরও সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই।”

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই নারীর মুক্তির অন্যতম উপায়, ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের আগাগোড়া এই কথাটাই পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই তারিণী ভবনে বহু উৎপীড়িত

নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে জীবনের সাফল্য খুঁজিয়া পাইয়াছে। পদ্মরাগের নায়িকা সিদ্দিকা বলিতেছে—'আমি আজীবন নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসার-ধর্ম্মই জীবনের সার ধর্ম্ম নহে।' তারিণী ভবনের পরিকল্পনার অন্তরালে রোকেয়ার নিজেরই কর্ম্মজীবনের বিষাদ-তিক্ত অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোকেয়ার সাহিত্যের বিশেষত্ব তাঁহার সহজ, সরস, তীক্ষ্ণ, জোরালো ভাষা। সে-যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ সরল, সুন্দর, প্রাণস্পর্শী, আন্তরিকতা ও সজীবতায় পূর্ণ রচনাভঙ্গি আর কাহারও আছে কিনা বলিতে পারি না। সর্ব্বত্রই তিনি যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং সকল সময়েই অকাট্য যুক্তি দ্বারা নিজের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতের মধ্যেও নির্ম্মমতার পরিবর্ত্তে তাঁহার দরদী মনটীর স্পষ্ট ছাপ দেখা যাইত। যাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কষা উত্তোলিত হইত, তাঁহাদের পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা সহজ হইত না ; এইজন্যই আঘাতের পরিবর্ত্তে তাঁহার উপর বর্ষিত হইত তীব্রতর আঘাত।

তিনি বলিয়াছেন—"আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর, সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগর তীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের, বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সমাজ-সেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইয়াছি।" কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার লেখা সকলশ্রেণীর পাঠকের চিত্তে যে আক্রোশ জাগাইত এমন কথা বলা যায় না। তাঁহার দেওয়া আঘাত হৃদয়বান ব্যক্তির মনে চিরকাল ফুল হইয়াই ফুটিয়া উঠিত।

শুধু বাংলা নয়, ইংরাজী ভাষায়ও রোকেয়া অবাধে লেখনী চালনা করিয়াছেন। ইংরাজীতে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। তাঁহার পড়িবার ঘরে আলমারীর মধ্যে একটী রূপার সুন্দর শামাদানি দেখিতে পাইতাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি সেই জিনিষটির ইতিহাস বলিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র জিনিষটি বহুকাল আগের একটি ছোট ঘটনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল। একবার কলিকাতার ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ. হলে একটি কবিতা-প্রতিযোগিতা হয়। মিস কর্ণেলিয়া সোরাবজীর একান্ত অনুরোধে রোকেয়া সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে হলে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন প্রতিযোগী মহিলারা প্রায় সকলেই ইউরোপীয়। দুই একজন বাঙ্গালী যাঁহারা আছেন তাঁহারা শিক্ষিতা,—বিশ্ববিদ্যালয়ের

উচ্চ-উপাধিধারিণী। একেই ভয়ে ভয়ে গিয়াছিলেন; গতিক দেখিয়া তাঁহার মন আরও দমিয়া গেল। হাতের মুঠার মধ্যে ছোট এক টুকরা কাগজে তিনি নিজের কবিতাটা সসঙ্কোচে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, বাহির করিতে সাহস হইতেছিল না। পরে যখন প্রতিযোগিতার ফল বাহির হইল, জানা গেল যে তিনিই প্রথম হইয়াছেন—আর সেই শামাদানিটি তাহারই পুরস্কার।

রোকেয়ার Sultana's dream (সুলতানার স্বপ্ন) একটি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তক। তিনি বলিয়াছেন—"সে বহুদিনের কথা (১৯০৫ খৃঃ)। আমরা তখন ভাগলপুরের বাঁকা নামক সাবডিবিসনে ছিলাম। আমার পূজনীয় স্বামী 'টুর'-এ গিয়াছিলেন; আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই দিন আমি কি করিতেছিলাম। তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, "Sultana's dream" দেখাইলাম। তিনি দাঁড়াইয়াই সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"A terrible revenge"! (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!) অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ম্যাকফার্সনের নিকট সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময় লেখাটা মিঃ ম্যাকফারসনের নিকট হইতে ফেরত

আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আঁচড় দেন নাই। তিনি সেই সঙ্গে ডিপুটী সাহেবকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality : and they are written in perfect English, * * * I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious." ভাবার্থ—"ইহাতে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ ও অপূর্ব্ব। রচনার ইংরাজীও নিখুঁত। * * * আমি সবিস্ময়ে মনে করি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা বায়ু-পথে কিরূপে ভ্রমণ করিব এখানে লেখিকা তাহারই আভাস দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা অতি মনোরম।"

বাস্তবিকই 'সুলতানার স্বপ্নে' তিনি এক অতি উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন এক অপূর্ব্ব, অদ্ভুত নারীরাজত্ব। পুরুষ সেখানে পর্দ্দার আড়ালে গৃহকোণে আবদ্ধ। আর নারীরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ চালাইতেছেন। দুনিয়ার যত পাপতাপ, যুদ্ধবিগ্রহ সব কিছুর জন্য তিনি দায়ী করিয়াছেন পুরুষকে। তাঁর কল্পিত নারীস্থানে

—পুরুষ যেখানে অবরোধরুদ্ধ, সেখানে দুঃখকষ্ট, অশান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই। সেখানে চারিদিকে খালি শান্তি আর শান্তি। তাঁহার এই স্বপ্ন সফল হইতে হয়ত বহুদিন লাগিবে। হয়ত বা এই স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার এই একটী মাত্র স্বপ্ন হইতেই মানুষ বহু বহুকাল পরেও এক নিমেষেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহার নারীত্বের আদর্শ কত উচ্চ ছিল—নারীর শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস কত পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল। তাঁহার এই স্বপ্ন হইতে যুগে যুগে বাংলার নারী অনুপ্রেরণা পাইবে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই যুগে যুগে তাহারা উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি : রোকেয়া আর নাই, তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

চিঠি

(এই পরিচ্ছেদে রোকেয়ার লিখিত কয়েকখানি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দেওয়া হইল। মনে হয়, এই চিঠিগুলিতে তাঁহার সত্যকার পরিচয় ধরা পড়িয়াছে। চিঠি ক'খানি পড়িলে যেন আরো সহজে তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুবিধা হয়)।

(১)

৪৬ লোয়ার সার্কুলার রোড
২২শে মে ১৯৩২

স্নেহাস্পদা নাহার,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গতকল্যকার মিটিংয়ে যেসব রিজলিউশান পাশ হইয়াছে তার নকল যদি আজই দিতে পার তো বেশ হয়। কারণ Asst. D. P. I. দেখতে চাচ্ছেন। শুভস্য শীঘ্রম্।

তুমি আজ ও কাল দুদিন বিশ্রাম করে আগামী পরশু সকালে ৯টা ও ১১টার মধ্যে দয়া করে নিশ্চয় এখানে আসিও। হয়ত খোদা তোমাকে দিয়েই আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। তাই তোমাকে চাই।

তোমার স্নেহের
আপা

খুলিতে পারি? কেহ তামাসা করিয়া সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার কথা লিখিয়া থাকিবে। আমি শিক্ষিত মহিলাবৃন্দকে দেখিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি। আমার চক্ষুকর্ণ ধন্য হইয়াছে। 'মঈমুন নেসওয়াঁ' (অর্থাৎ নারীকুলের সাহায্য) নামে সমিতি গঠনের জন্য জনৈক (সম্ভবতঃ অতি দরিদ্র) মহিলা হাতের আংটি খুলিয়া চাঁদার জন্য দিলেন। আলীগড়ের মেয়ে-কলেজ শীঘ্রই দশলক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। আর আমাদের বাংলা দেশ—আহা রে! সে কথা না বলাই ভাল। আমি যদি কিছু টাকা পাইতাম (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু খোদা আমাকে টাকা দেন নাই।

বলি, আমার বাংলাদেশ! যদি কিছু না-ই করিস, তবে দড়ি ও কলসীর সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস্‌তো! সেজন্যও আর বেশী ভাবনা নাই—ম্যালেরিয়া ও কালা-আজার সে ভার লইয়াছে!! আহা, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়।

*　　*　　*

তোমার দুলার চিঠিও পাইয়াছি। তিনিও আমার বক্তৃতার জন্য মোবারকবাদ দিয়াছেন। আরে, বোরকা-ঢাকা অবস্থায়

দু'একটি কথা বলিয়াছি কি বলি নাই, তাহারই নাম হইল 'বক্তৃতা' ! আর ব্যাটারা সব আমার নাম জানিল কিরূপে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি এখানে কাহাকেও বক্তৃতার কথা বলি নাই।

তোমার স্নেহের
বোন

(৪)

কলিকাতা
১৯। ৮। ২৬

অবসর অভাবে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই, সেজন্য দুঃখিত হইও না। আমার অবসর নাই বলিয়াই এতদিন মরিতেও সময় পাই নাই !

দাঙ্গায় আমরা প্রত্যক্ষে শহীদ হই নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতেছি ; তন্মধ্যে প্রধান দুইটী এই—
(১) অনেক লোক কলিকাতা ত্যাগ করায় স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা কমিয়াছে। (২) সইস, ক্যোচম্যান, দরওয়ান প্রভৃতি চাকর পাওয়া যায় না।

বোন, বলিলাম তো মরিবার অবসর পাই না ! পূর্ব্বের চেয়ে খাটুনি বাড়িয়াছে বই কমে নাই !

*　　　　*　　　　*

তোমার শুভাকাঙ্খিনী
ভগিনী

(৫)

কলিকাতা

২৪। ৩। ৩০

*　　　*　　　*

তুমি অমন আদর করে আমাকে যেতে বলেছ। তোমার প্রত্যেকটী কথায় স্নেহমমতা ভরা ছিল—তা' প'ড়ে প'ড়ে আমার চক্ষে জল আসছিল। আত্মীয়-স্বজনের মমতা কি মধুর জিনিষ, তা আমার মত আত্মীয়হারা না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না। শুনেছি লোকে বেহেশতে গিয়েও নাকি আত্মীয়-স্বজনের বিরহে ব্যাকুল হবে!

কিন্তু বোন, গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার যো নেই। এই যে স্কুলসংক্রান্ত রাশীকৃত office work, এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশ্‌তের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না!

তোমার স্নেহের

রোকেয়া।